সিররুল আসরার



হযরত গাউসুল আযম শায়খ আবদুল কাদের জিলানী
[রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]

سِرُّ الْاَسْرَارِ فِيْمَا يَحْتَاجُ اِلَيْهِ الْاَبْرَارُ

সির্‌রুল আসরার

মূল
গাউসুল আ'যম হযরত আবদুল কাদের জীলানী
(রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু)

ভাষান্তর
মুহাম্মদ আবদুল মজিদ

সন্‌জরী পাবলিকেশন
৪২/২ আজিমপুর ছোট দায়রা শরীফ, ঢাকা-১২০৫
৮১, শাহী জামে মসজিদ সুপার মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০

সির্‌রুল আসরার
মূল : গাউসুল আ'যম হযরত আবদুল কাদের জীলানী (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু)

ভাষান্তর :
মুহাম্মদ আবদুল মজিদ

সম্পাদনায় :
আবু আহমদ জামেউল আখতার চৌধুরী

প্রকাশক :
মুহাম্মদ আবু তৈয়ব চৌধুরী,

প্রকাশকাল :
৫ফেব্রুয়ারী ২০১২ ইং, ১২ রবিউল আউয়াল ১৪৩৩ হিঃ, ২৩ মাঘ ১৪১৮ বাংলা

পরিবেশনায় : সন্‌জরী বুক ডিপু
৮১,শাহী জামে মসজিদ মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম, মোবাইল : ০১৬১৩-১৬০১১১

প্রকাশনায় :
সন্‌জরী পাবলিকেশন
৪২/২ আজিমপুর ছোট দায়রা শরীফ, ঢাকা- ১২০৫, মোবাইল : ০১৯২৫-১৩২০৩১
৮১, শাহী জামে মসজিদ মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম, মোবাইল : ০১৬১৩-১৬০১১১

মূল্য : ১৭০ [একশত সত্তর] টাকা মাত্র

Sirrul Asrar, By: Gowsul Azam Hazrat Abdul Quader Zilani (R.), Translate By: Mohammad Abdul Mazid, Edited By: Abu Ahmad Jameul Akhtar Chowdhury. Published By: Mohammad Abu Tayub Chowdhury. Price: Tk: 170/-



مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا

عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِم

مُحَمَّدٌ سَيِّدُ الْكَوْنَيْنِ وَالثَّقَلَيْنِ

وَالْفَرِيْقَيْنِ مِنْ عُرْبٍ وَّمِنْ عَجَمِ

﴿صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكْ وَسَلَّمَ﴾

উৎসর্গ

মুন্সিগঞ্জ নিবাসী

জনাব আলহাজ্ব শহীদুল ইসলাম-এর দীর্ঘজীবন

ও

মরহুমা ফাতেমা বুলবুল-এর মাগফিরাত কামনায়

প্রকাশকের কথা

হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দীতে ইসলাম ও মুসলমানদের উপর করুণ ও লোমহর্ষক অবস্থা অতিক্রান্ত হওয়ার যুগসন্ধিক্ষণে বড়পীর গাউসুল আ'যম হযরত আবদুল কাদের জিলানী রাহমতুল্লাহি আলাইহি-এর হাতে ইসলাম ও মুসলিমের সমাজ পরিত্রাণ লাভ করে। ইসলামের প্রকৃত ও শাশ্বত আদর্শের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় তিনি কালজয়ী অবদান রাখেন। তাই তিনি 'মুহিউদ্দীন' (দ্বীনের পুনর্জীবনদানকারী) খেতাবে ভুষিত। বিশেষঃ তাসাউফ ও ত্বরীকতের নামে যাবতীয় ভণ্ডামীর মূলোৎপাটন এবং ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শের অনুবর্তিত সঠিক ত্বরীকত চর্চার মাধ্যমে তাসাওউফকে তার মূলরূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান এখনও চির স্মরণীয় হয়ে আছে। তিনি শুধু বক্তৃতা-বিবৃতি, প্রতিবাদের মাধ্যমে তাঁর কর্মপন্থাকে নির্দিষ্ট রাখেননি বরং শক্ত হাতে কলমও তুলে নেন। রচনা করে যান শরীয়ত-ত্বরীকতের রত্নতুল্য অমূল্য গ্রন্থরাজি। তাঁর রচিত পুস্তকগুলোর মধ্যে 'সিররুল আসরার' অন্যতম। তাসাওউফের নিগূঢ় রহস্য বর্ণনায় বিশেষত ত্বরীকতে দীক্ষিত শিষ্য-মুরিদ্‌দের জন্য এ পুস্তকটি মূল্যবান গাইড বুক। এ পুস্তকের আলোকে আমাদের ত্বরীকতের বিদ্যাপীঠ খানেকার নিয়ম-শৃঙ্খলা বিন্যস্ত করা জরুরী মনে করি।

ইতোপূর্বে অনেক প্রকাশনী পুস্তকটির বঙ্গানুবাদ করেছে। কিন্তু প্রায় অনুবাদ মূলের সাথে কোন সম্পর্ক নেই বললেও চলে। পুস্তকটির গুরুত্ব বিবেচনা করে মূল আরবী পুস্তকের সাথে মিল রেখে আমরা অনুবাদ করি। সাধ্যমত কুরআন-হাদীসের উদ্বৃতিগুলো গ্রন্থের আলোকে রেফারেন্স যোগ করতে ত্রুটি করা হয়নি। তারপরও কোন প্রকারের ত্রুটি কারো দৃষ্টিগোচর হলে আমাদেরকে জানালে কৃতার্থ হবো। সকলের শুভ কামনায়— ওয়াস্‌সালাম।

মুহাম্মদ আবু তৈয়ব চৌধুরী
সন্‌জারি পাবলিকেশন

সূচীপত্র

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الْحَمْدِ اللهِ الْقَادِرِ ، وَالنَّاظِرِ الْحَلِيْمِ ، الْجَوَّادِ الْكَرِيْمِ ، الرَّبِّ الرَّحِيْمِ ، مُنَزِّلِ الذِّكْرِ الْحَكِيْمِ وَالْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ ، عَلي الْمَبْعُوْثِ بِالدِّيْنِ الْقَوِيْمِ ، وَالصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيْمِ ، ﴿وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلي﴾ خَاتَمِ الرِّسَالَةِ ، وَالْهَادِيْ مِنَ الضَّلاَلَةِ ، اَلْمُشَرَّفِ الْمُرْسَلِ بِأَشْرَفِ الْكُتُبِ اِلي الْعَجْمِ وَالْعَرْبِ ، مُحَمَّدُ النَّبِيُ ﴿الْاُمِّيِ﴾ الْعَرَبِيِّ ﴿الْاَمِيْنِ﴾ صَلّي اللهُ تَعَالي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلي اٰلِهِ ﴿هُدَاةُ﴾ الْمُهْتَدِيْنَ ، وَأَصْحَابِهِ الْاَخْيَارِ [الْمُنْتَجِبِيْنَ] ، وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا ، وَحَمْدًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا ،

প্রাককথা
ইল্‌ম ও আলিমের মর্যাদা

ইলমের ফযীলত ও মর্যাদা সুউচ্চ। জ্ঞান খ্যাতি ও উপকারের প্রস্রবণ। জ্ঞানই আল্লাহর পরিচিতির মাধ্যম এবং সম্মানিত নবী ও রাসূলগণের সত্যায়নের ওসীলা। আর জ্ঞানীগণ আল্লাহ তা'আলার বিশেষ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত। যাঁদেরকে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় একত্ববাদের পথসমূহ উন্মুক্ত করার জন্য নির্বাচিত করেছেন এবং তাঁর বিশেষ কৃপা ও অনুগ্রহ দ্বারা তাদেরকে পথনির্দেশ করেছেন। তিনি জ্ঞানীদেরকে অন্যান্য লোকদের উপর বিশেষ মর্যাদা দান করে তাঁর নৈকট্য ধন্য করেছেন। তিনি ওলীগণকে সম্মানিত নবী ও রাসূলগণের উত্তরাধিকারী, প্রতিনিধি, সেবক ও রহস্যদ্বার বানিয়েছেন। প্রকৃত পক্ষে তাঁরাই মারিফাতের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। যেমন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

ثُمَّ أَوْرَثْنَا ٱلْكِتَـٰبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۖ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِۦ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌۢ بِٱلْخَيْرَٰتِ ﴿٣٢﴾

–অতঃপর আমি কিতাবের উত্তরাধিকারী করলাম আমার মনোনীত বান্দাদেরকে। তবে তাঁদের মধ্যে কেউ নিজের প্রাণের প্রতি অত্যাচারী

এবং কেউ মধ্যম পন্থী। আর কেউ আল্লাহর ইচ্ছায় কল্যাণকর কাজে অগ্রগামী।[১]

হুযুর নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

اَلْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ بِالْعِلْمِ وَيُحِبُّهُمْ اَفْضَلُ السَّمَاءِ وَيَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْحِيْتَانُ فِي الْبَحْرِ،

–আলিমগণই সম্মানিত নবীগণের জ্ঞান ভাণ্ডারের উত্তরাধিকারী। আকাশ জগতের উত্তম সৃষ্টি (ফেরেস্তাকুল) ও সমুদ্রের মৎস্যকুল তাঁদের জন্য ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রার্থনা করতে থাকে।[২]

আল্লাহ তা'আলার বাণী,

إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَٰٓؤُا۟ ﴿٢٨﴾

–নিশ্চয় বান্দাদের মধ্যে আলিমগণই আল্লাহকে ভয় করে।[৩]

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

يَبْعَثُ اللهُ تَعَالَى الْعِبَادَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يُمَيِّزُ الْعُلَمَاءُ فَيَقُوْلُ : يَا مَعْشَرَ الْعُلَمَاءِ إِنِّي لَمْ أَضَعْ فِيْكُمْ عِلْمِيْ لِأَعْذَبِكُمْ اذْهَبُوْا فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ،

–কিয়ামত দিবসে যখন আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিকুলের উত্থান ঘটাবেন তখন (হাশরের ময়দানে) আলিমদেরকে বিশেষ মর্যাদায় পৃথক রাখবেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলবেন, হে জ্ঞানীদের দল! আমি তোমাদেরকে আমার ইল্ম দ্বারা এ জন্য অনুকম্পিত করেছিলাম যে, তোমরাই এর উপযুক্ত ছিলে। আর আমি তোমাদের নিকট ইলম গচ্ছিত রেখে তা বিনষ্ট হতে দিইনি। অতএব জান্নাতে প্রবেশ করো, আমি তোমাদের জন্য ক্ষমা ও মার্জনার পথসমূহ উন্মুক্ত করে দিয়েছি এবং শাস্তি থেকে মুক্ত করে দিয়েছি।[৪]

সর্বাবস্থায় যাবতীয় প্রশংসার মালিক আল্লাহ তা'আলাই, যিনি বিশ্ব-জগতের প্রতিপালক। তিনি এমন মহান সত্তা যিনি পদমর্যাদাসমূহ ইবাদতকারীদের এবং

[১]. আল কুরআন : সূরা ফাতির, ৩৫/৩২;
[২] তিরমিযী : আস্ সুনান, ৯/২৯৬; আবূ দাউদ : আস্ সুনান, ১০/৪৯; তাবরিযী : মিশকাত, পৃ. ৪৬;
[৩]. আল কুরআন : সূরা ফাতির, ৩৫/২৮;
[৪]. আলূসী : তাফসীর-ই আলূসী, ২/৩৬২; রাযী : তাফসীর-ই রাযী , ১/৪৫৮;

নৈকট্যের স্তরসমূহ খোদাতত্ত্বজ্ঞানীদের জন্য নির্ধারণ করে রেখেছেন। [হযরত সায়্যিদুনা গাউসে পাক রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু বলেন,] মারিফাত অন্বেষীদের মধ্যে জনৈক সৌভাগ্যবান (মুরীদ) আমাকে অনুরোধ করল যেন তার জন্য এমন একটি পুস্তক রচনা করি যেটার প্রতি পুণ্যাত্মাগণও মুখাপেক্ষী হয়। তাই তার অভিপ্রায় অনুযায়ী আমি এ সংক্ষিপ্ত পুস্তক রচনা করেছি, যেটা শুধু তার জন্য উপকারী হবে না বরং অন্যান্য হাকীকত-সন্ধানীদের প্রত্যাশা পূরণেও যথেষ্ট হবে। আমি এর নাম- 'সিররুল আসরার ফী-মা ইয়াহতাজু ইলাইহিল আবরার' রেখেছি। আমি এ পুস্তকে শরীয়ত, ত্বরীকত ও হাকীকতের ওইসব মাসয়ালা বর্ণনা করার চেষ্টা করেছি যেগুলো সাধারণত খোদান্বেষীগণ অনুসন্ধান করে থাকেন।

আমি এ পুস্তক কালিমায়ে তায়্যিবার চব্বিশটি বর্ণ ও দিবারাত্রির চব্বিশ ঘন্টা অনুযায়ী একটি ভূমিকা ও চব্বিশটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করেছি।

ভূমিকা

হে পাঠক ও শ্রোতা! তুমি একথা উত্তমরূপে উপলব্ধি কর। আর আল্লাহ তা'আলা তোমাকে ঐসব কিছুর সামর্থ দান করুন, যা তিনি পছন্দ করেন এবং যা দ্বারা তাঁর সন্তুষ্টি লাভ করা যায়।

জগত সৃষ্টির পটভূমি

সর্বপ্রথম আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় হাবীব নবী করীম মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বীয় সৌন্দর্যের (جمال) জ্যোতি থেকে সৃষ্টি করেছেন। যেমনিভাবে হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

خَلَقْتُ رُوْحَ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ نُوْرِيْ وَجْهِيْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللهُ رُوْحِيْ وَاَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ نُوْرِيْ اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللهُ الْقَلَمَ وَ اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللهُ الْعَقْلَ [فَالْمُرَادُ مِنْهَا شَيْءٌ وَّاحِدٌ وَهُوَ الْحَقِيْقَةُ الْمَحْمُدِيَّةُ عَلَيْهِ التَّحِيَّةُ وَالثَّنَاءُ]

'আমি সর্বপ্রথম আমার সত্তার নূর দ্বারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের রূহ মোবারক সৃজন করেছি। যেমন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো এরশাদ করেছেন, সর্বপ্রথম আল্লাহ তা'আলা আমার রূহ বা আত্মাকে সৃষ্টি করেছেন। সর্বাগ্রে আল্লাহ তা'আলা আমার নূর সৃষ্টি করেছেন। সবকিছুর পূর্বে আল্লাহ তা'আলা কলম সৃষ্টি করেছেন। সর্বপ্রথম আল্লাহ তা'আলা আকল সৃষ্টি করেছেন। আর এসবগুলো দ্বারা উদ্দেশ্য হল হাকীকতে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম।'[১]

নূর

অগণিত গুণাবলীর আধার হুযুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্তাকে 'নূর' নামে এ জন্য আখ্যায়িত করা হয়েছে যে, তিনি আল্লাহর মহিমার অন্ধকার (ظلمات) থেকে পূত-পবিত্র।

[১]. নিশাপুরী : তাফসীর-ই নিশাপুরী, ৫/১৪২

যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন–

قَدْ جَآءَكُم مِّنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَـٰبٌ مُّبِينٌ ﴿١٥﴾

–নিশ্চয় তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি জ্যোতি ও সুস্পষ্ট কিতাব আবির্ভূত হয়েছে।'[১]

[এখানে 'নূর' দ্বারা হুযুর নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সত্তা ও 'কিতাব' দ্বারা কুরআন মজীদ উদ্দেশ্য।– অনুবাদক]

আকল

নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরকতময় সত্তাকে 'আকল' (জ্ঞান) দ্বারা ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্য হল যে, তাঁকে সকল বিষয়ের সন্তুষ্টিগত জ্ঞান দান করা হয়েছে।

কলম

আর 'কলম' দ্বারা এজন্য নামকরণ করা হয়েছে যে, কলম হচ্ছে জ্ঞান প্রসারের মাধ্যম। যেমনি লিপির জগতে এটা জ্ঞানের মূল মাধ্যম ও উপকরণ তেমনি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমগ্র সৃষ্টির মূল, জগত সৃষ্টির সূচনা ও আসল। তাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন–

اَنَامِنَ اللهِ وَالْمُؤْمِنُوْنَ مِنِّيْ ،

–আমি আল্লাহ থেকে আর সকল ঈমানদার আমার থেকে।[২]

আল্লাহ তা'আলা মানবজাতির রূহগুলোকে আলমে-লাহুতে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্তা থেকে সুন্দরতম গঠনে প্রকৃত আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। এটা ওই জগতের মানবজাতির ঘর। আর ওটাই আসল জগত। যখন রাসূলে পাকের রূহ মোবারক সৃষ্টির পর চার হাজার বছর অতিবাহিত হল তখন আল্লাহ তা'আলা নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের চক্ষু মোবারক (এর নূর) থেকে আরশ সৃষ্টি করলেন। আর অবশিষ্ট জগতসমূহ আরশ থেকে সৃষ্টি করলেন। অতঃপর সৃষ্ট রূহগুলোকে (দেহ ও কায়ায়

[১]. আল-কুরআন : সূরা মায়িদা, ৫/১৫
[২]. হক্বী : তাফসীর-ই হক্বী, ৩/২১৭; সাখাভী : মাকাসিদুল হাসানাহ, ১/৫৫.

পরিবর্তন করে) সর্বাধিক নিম্নস্তরে স্থানান্তরিত করে দেয়া হল। যেমন, আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন–

ثُمَّ رَدَدْنَٰهُ أَسْفَلَ سَٰفِلِينَ ﴿٥﴾

–অতঃপর আমি তাকে নিম্ন থেকে নিম্নতর স্তরে প্রত্যাবর্তিত করেছি।[১]

অর্থাৎ আলমে-লাহুতে থেকে আলমে-জবারুতে রেখেছেন। এরপর আল্লাহ তা'আলা ঐরূহগুলোকে দু'হেরেমের মধ্যখানে জাবারুতের নূরের পোশাক পরিধান করিয়েছেন। আর এটাই হচ্ছে রূহে-সুলতানী। অতঃপর তাদেরকে ঐ পোশাকে আলমে মালাকুতে প্রেরণ করলেন এবং মালাকুতের নূরের পোশাক দ্বারা সুসজ্জিত করলেন। এটাকে রূহে সুলতানী বলা হয়। অতঃপর আলমে মুল্‌কে (এ নশ্বর জগতে) প্রেরণ করে তাদেরকে নূরের আচ্ছাদন দান করলেন। আর এটা হল রূহে জিসমানী (কায়িক আত্মা)। অতঃপর আলমে-মূল্‌ক থেকে দেহ ও কায়ার জগত (عالم اجساد واجسام) সৃষ্টি করেছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন–

مِنْهَا خَلَقْنَٰكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ﴿٥٥﴾

–আমি ভূ-পৃষ্ঠ থেকে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, সেটার মধ্যেই তোমাদেরকে নিয়ে যাব এবং পুনরায় সেটা থেকে তোমাদেরকে বের করব।[২]

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা রূহগুলোকে কায়ায় প্রবেশের নির্দেশ দিলেন। আর সেগুলো নির্দেশ পেতেই কায়াসমূহে প্রবিষ্ট হয়ে গেল। যেমন, মহামহিম রবের বাণী-

وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِى ﴿٧٢﴾

–এবং আমি তাতে রূহ সঞ্চার করেছি।[৩]

---

[১]. আল কুরআন : সূরা ত্বীন, ৯৫/৫
[২]. আল কুরআন : সূরা তোয়াহা, ২০/৫৫
[৩]. আল কুরআন : সূরা সোয়াদ, ৩৮/৭২

যখন আত্মা ও দেহের সম্বন্ধ সুদৃঢ় হল, আত্মা ও দেহের মধ্যে প্রীতির বন্ধন গড়ে উঠল, তখন সেগুলো দৃঢ় অঙ্গীকারের কথা ভুলে গেল। আর অঙ্গিকার ছিল–

أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا۟ بَلَىٰ ﴿١٧٢﴾

–আমি কি তোমাদের রব নই? সবাই সমস্বরে বলেছিল, হ্যাঁ, আপনিই আমাদের একমাত্র প্রতিপালক।[১]

মানুষ যাতে প্রতিশ্রুতির কথা বিস্মৃত হয়ে আসল জগতে প্রত্যাবর্তন করতে না পারে সেজন্য দয়াময় আল্লাহ আসমানী কিতাব অবতীর্ণ করে অবিনশ্বর মূল ঠিকানার কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। এরশাদ করলেন–

وَذَكِّرْهُم بِأَيَّىٰمِ ٱللَّهِ ﴿٥﴾

–আর (হে রাসূল!) আপনি তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার (সাথে প্রতিশ্রুতির) দিনগুলো স্মরণ করিয়ে দিন।[২]

অর্থাৎ আল্লাহর সাথে মিলনের ঐসব দিন স্মরণ করে দিলেন যেগুলো রূহসমূহ দর্শন করেছে। আর সকল রাসূল ও নবীগণ তাদেরকে ওই দিনসমূহ স্মরণ করিয়ে দেয়ার লক্ষ্যে ধরাধামে আগমন করেছেন। অতঃপর পরজগতে পাড়ি জমান। কিন্তু খুব অল্পসংখ্যক লোকই তাঁদের উপদেশের উপর আমল করেছে এবং তাতে আগ্রহী হয়েছে। (অধিকিন্তু যে সব লোক তাদের প্রতি নিবিষ্ট হল) তাদের হৃদয় আসল জগতের প্রেমে উদ্দোলিত হল এবং তারা সফলভাবে লক্ষ্যস্থলে উপনীত হয়ে গেল। এভাবে শেষ পর্যন্ত নবুয়তের এ মিশন মহান, নবুয়ত ও রিসালাতের ধারা সমাপ্তকারী, সঠিক পথনির্দেশক রাসূল মুহাম্মদ মুস্ত ফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করল। যেসব লোকের হৃদয়ে উদাসীনতার পর্দা পড়েছিল তাদের অন্তর্দৃষ্টিকে উদাসীনতার নিদ্রা থেকে সজাগ করার জন্য আল্লাহ তা'আলা তাঁকে প্রেরণ করেছেন। অধিকন্তু হুযুর নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার সাথে মিলন ও তাঁর অনাদি সৌন্দর্য দর্শনের প্রতি আহ্বান করতে লাগলেন। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন–

---

[১]. আল কুরআন : সূরা আ'রাফ, ৭/১৭২
[২]. আল কুরআন : সূরা ইবরাহীম, ১৪/৫

قُلْ هَٰذِهِۦ سَبِيلِىٓ أَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا۠ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِى

–হে হাবীব! আপনি বলে দিন এটাই আমার পথ, আমি আল্লাহর প্রতি আহ্বান করছি। আমি ও আমার অনুসারীরা অন্তরচক্ষু সম্পন্ন।[১]

নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন–

أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ

–আমার সাহাবায়ে কিরামগণ নক্ষত্রতুল্য, তাদের মধ্যে তোমরা যার পদাঙ্কই অনুসরণ করবে সৎপথ লাভ করবে।[২]

অন্তর্দৃষ্টি (بصيرت) হল আত্মার চক্ষু, যা আউলিয়ায়ে কিরামদের মাধ্যমে অন্ত করণে উন্মোচিত হয়। যা প্রকাশ্য জ্ঞান (علم ظاهر) দ্বারা অর্জিত হয় না বরং অপ্রকাশ্য (باطني) তথা ইলমে লাদুন্নীর মাধ্যমে লাভ হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন–

وَعَلَّمْنَٰهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا ﴿٦٥﴾

–আমি তাকে (খিযির আলাইহিস সালামকে) আমার বিশেষ জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন।[৩]

তাই মানুষের জন্য অত্যাবশ্যক হল তারা যেন অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ও আলমে-লাহুতের রহস্য সম্পর্কে জ্ঞাতা মুরশিদে-কামিলের দীক্ষা লাভ করে বাতিনী দৃষ্টি অর্জনে সচেষ্ট হয়।

হে আমার ভাইগণ! সাবধান! তাওবা করে আপন প্রতিপালকের ক্ষমা লাভের জন্য অগ্রসর হও। যেভাবে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন–

وَسَارِعُوٓا۟ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٣﴾

[১]. আল কুরআন : সূরা ইউসুফ, ১২/১০৮
[২]. তাবরিযী : মিশকাত শরীফ, পৃ. ৩১০
[৩]. আল কুরআন : সূরা কাহ্‌ফ, ১৮/৬৫

–এবং দ্রুত অগ্রসর হও স্বীয় প্রতিপালকের ক্ষমা ও এমন বেহেশতের প্রতি যার প্রশস্ত আসমান ও যমীনের সমান, যা খোদাভীরুদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।[১]

অতএব তোমরা তরীকতের পথ গ্রহণ কর এবং আধ্যাত্মিক কাফেলা (অভিযাত্রা) গুলোর সাথে আপন প্রতিপালকের প্রতি অগ্রসর হও। কেননা, অতি শীঘ্রই এ পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে। আর তুমি ওই আসলজগতে পৌঁছার কোন সফরসঙ্গী পাবে না। আমরা এ ধ্বংসশীল উপত্যাকায় (নশ্বর পৃথিবীতে) স্থায়ীভাবে অবস্থানের জন্য আসিনি এবং না পানাহার আমাদের আসল উদ্দেশ্য। আর না কু-রিপু ও মন্দচিত্তের স্বাদের পরিতৃপ্তি লাভের জন্য আমরা এসেছি। হে লোক সকল! তোমাদের প্রিয় রাসূল তোমাদের প্রতীক্ষায় ও তোমাদের জন্য চিন্তিত রয়েছেন। যেমন স্বয়ং সরকারে দো'আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন–

غَمِّيْ لِأَجَلِ أُمَّتِيْ الَّذِيْ فِيْ أٰخِرِ الزَّمَانِ،

–আমার চিন্তা ও উৎকণ্ঠা শেষ যুগে আগমনকারী আমার উম্মতের জন্য।

ইলমে জাহের ও ইলমে বাতেন

আমাদেরকে দু'প্রকারের জ্ঞান দান করা হয়েছে। তা হচ্ছে– ১. জাহেরী বা শরীয়তের জ্ঞান। ২. বাতিনী বা মারিফতের জ্ঞান।

শরীয়তের বিধান আমাদের জাহেরের উপর আর মারিফতের হুকুম বাতেনের উপর কার্যকর হয়। এ দ্বিবিধ ইলমের সংমিশ্রণের ফল হল ইলমে হাকীকত। যেভাবে বৃক্ষ ও পাতার সন্নিবেশে ফল উৎপন্ন হয়। আল্লাহ তা'আলার বাণী–

مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ﴿١٩﴾ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ ﴿٢٠﴾

–তিনি দু'টি সমুদ্র প্রবাহিত করেছেন, যা দেখতে পরস্পর মিলিত আর এ দু'টোর মধ্যে অন্তরায় রয়েছে যে, একটা অপরটাকে অতিক্রম করতে পারে না।[২]

[১]. আল কুরআন : সূরা আলে ইমরান, ৩/১৩৩
[২]. আল কুরআন : সূরা আর্ রাহমান, ৫৫/১৯-২০

শুধুমাত্র জাহেরী জ্ঞান দ্বারা হাকীকত পর্যন্ত পৌঁছা সম্ভব নয়, আর না লক্ষ্যস্থলে পৌঁছা যায়। (ইবাদতের পূর্ণতার জন্য উভয় প্রকার জ্ঞান থাকা অপরিহার্য, যে-কোন একটা যথেষ্ট নয়।) যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

–আমি জীন ও মানুষকে আমার ইবাদত-বন্দেগীর জন্য সৃষ্টি করেছি।[১]

অর্থাৎ তারা আমার পরিচয় লাভের জন্য সচেষ্ট থাকবে। কারণ, যে আল্লাহ তা'আলার মহান সত্তার জ্ঞান রাখে না, সে তাঁর ইবাদত কিভাবে করবে? অন্তরের পরিচ্ছন্নতা ও হৃদয়ের দর্পণ থেকে প্রবৃত্তির তাড়নার মালিন্য ও কদর্যতা দূর করার মাধ্যমে আল্লাহর পরিচিতি (معرفت الهية) অর্জন করা যায়। আর যখন আল্লাহর পরিচয় জ্ঞান লাভ হয়, তখন অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে গুপ্ত ধন-ভাণ্ডার (كنز مخفي) এর জ্যোতি দর্শন সম্ভবপর হয়। যেমন, হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ ،

–'আমি গুপ্ত ধন-ভাণ্ডার ছিলাম। আর যখন আমি পরিচিত হওয়ার অভিপ্রায় করলাম তখন মখলুক (বিশ্ব চরাচর) সৃষ্টি করলাম।' (যেন তারা আমার পরিচয় লাভ করে)।[২]

সুতরাং একথা স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হল যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে তাঁর মা'রিফাত বা পরিচয় অবগত হওয়ার জন্যই সৃষ্টি করেছেন।

মারিফাতের প্রকারভেদ

মারিফাত দু'প্রকার। যথা- ১. আল্লাহর সত্তাগত পরিচয় (معرفة الذات)।
২. আল্লাহর গুণগত পরিচয় (معرفة الصفات)।

সিফাতী (গুণগত) মারিফাত হল ইহকাল ও পরকাল উভয় জগতের মধ্যে তাঁর আকারহীন অস্তিত্বের প্রকাশ। আর সত্তাগত মারিফাত হল পরজগতে রূহে-কুদসী আল্লাহর রূহের পরিচয়ের বিশেষ অংশ লাভ করা। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন–

[১]. আল কুরআন : সূরা আয্‌যারিয়াত, ৫১/৫৬
[২]. মোল্লা আলী কারী : মিরকাতুল মাফাতীহ, ১/৪৪২

وَأَيَّدْنَٰهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ ﴿٢٥٣﴾

–আমি তাকে পবিত্র রূহ দ্বারা সাহায্য করেছি।[১]

এ দ্বিবিধ মারিফাত– মারিফাতে যাতী ও মারিফাতে সিফাতী, দু'প্রকার জ্ঞান ব্যতীত পাওয়া যায় না। তা হল- ১. জাহেরী জ্ঞান ও ২. বাতিনী জ্ঞান। যেগুলোর আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী–

اَلْعِلْمُ عِلْمَانِ : عِلْمٌ عَلَى اللِّسَانِ ، فَذَاكَ حُجَّةُ اللهِ عَلَى ابْنَ آدَمَ ، وَعِلْمٌ فِي الْقَلْبِ ، فَذَاكَ الْعِلْمُ النَّافِعُ ،

ইলম বা জ্ঞান দ্বিবিধ– ১. মৌখিক ইলম, এটা বান্দার প্রতি আল্লাহর দলীল স্বরূপ। ২. আধ্যাত্মিক ইলম, এটা উপকারী ইলম যা লক্ষ্যস্থলে পৌঁছার জন্য খুবই উপকারী।[২]

মানুষের জন্য প্রথমত শরীয়তের জ্ঞান অর্জন করা জরুরী। যেন তার শরীর মারিফাত জগতের গুণাবলীতে ঐ মহান সত্তার পরিচয় লাভ করতে পারে। আর এটা অনেক মর্যাদা সম্বলিত। তারপর মানুষ বাতিনী জ্ঞানের প্রতি মুখাপেক্ষী, যেন রূহ মারিফাতের জগতে আল্লাহর পরিচয় লাভ করতে পারে। শরীয়ত ও তরীকতের বিপরীত মারিফাতরূপি যেসব বিষয়ে পাওয়া যায় তা বর্জন করা ব্যতীত ওই প্রকৃত মারিফাত হাসিল করা সম্ভব নয়। সেটা অর্জনের জন্য এমন দৈহিক ও আত্মিক পরিশ্রম ও সাধনার প্রয়োজন যা নিরেট আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই হবে, কাউকে শুনানো কিংবা দেখানোর জন্য হবে না। মহান রব এরশাদ করেন–

فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَٰلِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ أَحَدًۢا ﴿١١٠﴾

–অতএব যে ব্যক্তি আপন রবের সাথে সাক্ষাতের আশা রাখে তার উচিত সৎকর্ম করা ও স্বীয় রবের ইবাদতে কাউকে অংশীদার না করা।[৩]

[১]. আল কুরআন : সূরা বাকারা, ২/২৫৩
[২]. ইবনে রজব হাম্বলী : জামিউল উলূম ওয়াল হিকম, পৃ. ২১; শরহে মসনদে আবী হানিফা, পৃ. ৩৯
[৩]. আল কুরআন : সূরা কাহফ, ১৮/১১০

মারিফাতের জগত

আলমে-লাহুত, যা মূল ঠিকানা (যেটার আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে) যেখানে আল্লাহ তা'আলা রূহে-কুদসীকে অত্যন্ত সুন্দররূপে সৃষ্টি করেছেন। এখানে 'রূহে-কুদসী' মানে প্রকৃত মানুষ, যা অন্তরের অন্তস্থলে সংরক্ষিত আছে। যার অস্তিত্বের প্রকাশ তাওবা, তালকীন (দীক্ষা) ও কালেমায়ে তাওহীদ- لا إله إلا الله محمد رسول الله প্রথমত মুখে সর্বদা যিক্‌র করার মাধ্যমে হয়ে থাকে। এভাবে অন্তরের সজীবতা লাভের পর কালেমায়ে-তাওহীদের যিকর নিষ্টাপূর্ণ অন্তরে করা হবে। এ মুহূর্তটিকে সম্মানিত সূফীগণ তাঁদের পরিভাষায় 'তিফলুল মা'আনী' (খোদা তত্ত্বজ্ঞানের নবজাতক) নামে নামকরণ করেন। কারণ, তখন রহস্যাবৃত বিষয়াদি ও গুণাবলীর প্রকাশ ঘটে। আর 'তিফলুল মা'আনী' নামে এটার নামকরণের বিভিন্ন কারণ রয়েছে। যেমন–

১. এটা অন্তরে হয়ে থাকে। (অর্থাৎ এ যিকর অন্তর দ্বারা করা হয়) যেমন, শিশু মায়ের উদর হতে জন্মলাভ করে কিন্তু পিতা তাকে প্রতিপালন করেন। অতঃপর ক্রমান্বয়ে বড় হয়ে থাকে।

২. সাধারণত শিশুকে জাহেরী শিক্ষা দেয়া হয়। তদ্রূপ এ শিশুকেও মারিফাত শিক্ষা দেয়া হয়।

৩. যেভাবে কায়িক ও দুনিয়াবী শিশুকে প্রকাশ্য পাপের মলিনতা ও কদর্যতা থেকে পবিত্র রাখা হয় তেমনি ঐরূহানী শিশুকেও শিরক, বিদআত, উদাসীনতা ও আলস্যের কলুষতা থেকে পবিত্র রাখা হয়।

৪. এ শিশু পবিত্র ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্নভাবে বেড়ে উঠে এবং এক পর্যায়ে এ শিশু স্বপ্নে অভিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের আকৃতিতে ফেরেশতাদের মত (নিষ্পাপ) দৃষ্ট হয়।

৫. আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের পুরস্কারকে শৈশবাবস্থার সাথে বর্ণনা করেছেন। এরশাদ করেছেন–

يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ ﴿١٧﴾

–বেহেশতবাসীর সেবার জন্য চির কিশোররা তাদের চতুপার্শ্বে ঘুরতে থাকবে।[১]

[১]. আল কুরআন : সূরা ওয়াকিয়া ৫৬:১৭

অন্যত্র এরশাদ করেন–

وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ ﴿٢٤﴾

–এবং তাদের সেবক বালকগণ তাদের চতুর্দিকে ঘুরবে, আর তারা যেন সুরক্ষিত মণি-মুক্তা।[১]

৬. এ নাম তার পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা, ও কোমলতার দৃষ্টিকোণে রাখা হয়েছে।

৭. কায়িক সম্বন্ধ ও মানবীয় আকৃতির দৃষ্টিকোণে ওই নামের সাথে 'তিফলুন' শব্দের প্রয়োগ রূপক হিসেবে এবং এ প্রয়োগ তার লাবণ্য, সৌন্দর্য ও গ্রহণযোগ্যতার ভিত্তিতে করা হয়। রিক্ততা, ফানা ও আত্মার পবিত্রতার ভিত্তিতে নয়। আর এটার প্রাথমিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে স্পষ্ট হয় যে, সেই প্রকৃত মানুষ। কেননা, সেটার সাথে আল্লাহ তা'আলার সত্তার এমন সম্বন্ধ রয়েছে যে, তা শরীর ও কায়িক উপকরণ সম্পর্কে অজ্ঞাত। যেমন, হুযুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন–

لِيْ مَعَ اللهِ وَقْتٌ لاَ يَسْعَنِيْ فِيْهِ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلاَ نَبِيٌّ مُرْسَلٌ،

–আমার জন্য আল্লাহ তা'আলার সংশ্রবের এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে, যাতে না কোন নৈকট্যধন্য ফেরেশতা এবং না কোন রিসালতপ্রাপ্ত নবীর অবস্থানের অবকাশ থাকে।[২]

এটা নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানবীয় পোশাকধারী হওয়ার ভাষ্য। আর নৈকট্য ধন্য ফেরেশতা (ملك مقرب) দ্বারা এমন আধ্যাত্মিক শক্তি উদ্দেশ্য যা জাবারুতের নূর দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। আর ফেরেশতাগণ ঐ নূর হতে সৃষ্ট, ফলে আলাম-লাহুতের নূরের মধ্যে ফেরেশতাদের প্রবেশাধিকার ও কর্তৃত্ব নেই। নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন–

إِنَّ لِلّٰهِ جَنَّةً لاَفِيْهَا حُوْرٌ، وَلاَقُصُوْرٌ وَلاَجِنَانٌ وَلاَعَسَلٌ وَلاَلَبَنٌ بَلْ نَظَرَ اِلٰى وَجْهِ اللهِ تَعَالٰى،

[১]. আল কুরআন : সূরা তূর, ৫২:২৪
[২]. মোল্লা আলী কারী : মিরকাতুল মাফাতীহ, باب: كتاب الايمان, ১/১৪২

–নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলার এমন একটি জান্নাত রয়েছে যেখানে না হুর আছে, না বালাখানা আছে, আর না মধু ও দুধ রয়েছে। বরং সেখানে শুধু আল্লাহ তা'আলার দীদার ও দর্শনের নেয়ামতই রয়েছে।

যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ﴿٢٢﴾

–ওই দিন অনেক মুখ উজ্জ্বল হবে।[১]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন–

سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ،

–অচিরেই তোমরা আপন প্রতিপালককে দেখতে পাবে যেভাবে পূর্ণিমার চাঁদ দেখতে পাও।[২]

যদি ফেরেশতা কিংবা কায়িক মানুষ তাতে প্রবিষ্ট হয় তাহলে জ্বলে ভস্মীভূত হয়ে যাবে। যেমন হাদীসে কুদসীতে রয়েছে–

لَوْ كَشَفَ سُبْحَاتِ وَجْهِ جَلَالِي لَاحْتَرَقَتْ كُلُّ مَا انْتَهَي اِلَيْهِ بَصَرِي ،

–যদি আমি আমার মহত্ত্বের জ্যোতি প্রকাশ করি তাহলে সবকিছু জ্বলে ভস্মে পরিণত হবে যেটুকু পর্যন্ত আমার জ্যোতি প্রকাশ পাবে।[৩]

যেভাবে হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম (মি'রাজ রজনীতে) আবেদন করেছিলেন–

لَوْ دَنَوْتُ اَنْمِلَةً لَاحْتَرَقْتُ ،

–যদি আমি এক আঙ্গুল পরিমাণ অগ্রসর হই তবে জ্বলে যাবো।[৪]

---

১. আল কুরআন : সূরা কিয়ামাহ, ৭৫/২২
২. তিরমিযী : আস্ সুনান, ৩/২৩৬; ইমাম রাযী : তাফসীর-ই রাযী, ৬/৪২৪
৩. ইবনে হাব্বান : সহীহ ইবনে হাব্বান, ২/১৮
৪. মোল্লা আলী কারী : মিরকাতুল মাফাতীহ, ১৬/৩৯০

প্রথম অধ্যায়

মানুষ ও তার আসল ঠিকানা

মানুষ দুই প্রকার। যথা- ১. জিসমানী (কায়িক)।
২. রূহানী (আধ্যাত্মিক)।

জিসমানী হল সাধারণ মানুষ আর রূহানী হল বিশেষ মানুষ। সাধারণ মানুষের প্রত্যাবর্তন নিজ ঘরের প্রতি হয়। আর তা ওই সব সু-উচ্চ মর্যাদা ও সোপান। যা ইলমে শরীয়ত, তরীকত ও মারিফাতের বিধানের উপর আমল করার দরুন অর্জিত হয়। আর ওই মর্যাদা তিনটি স্তরে বিভক্ত–

১. আলমে মুলকস্থিত জান্নাত, যাকে জান্নাতুল মাওয়া বলা হয়।
২. ঐ জান্নাত যা আলমে মালাকুতে অবস্থিত, এটাকে জান্নাতুন নাঈম বলা হয়।
৩. ঐ জান্নাত যা আলমে জাবারুতে রয়েছে, এটাকে জান্নাতুল ফিরদাউস বলা হয়ে থাকে।

এ ত্রিবিধ হল কায়িক পুরস্কার। আর কায়া তিন প্রকার ইলম ব্যতীত জ্ঞানের রাজ্যে পৌঁছাতে পারে না। এ ইলমত্রয় হল– ১. ইলমে শরীয়ত, ২. ইলমে তরীকত ও ৩. ইলমে মারিফাত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমান–

اَلْحِكْمَةُ الْجَامِعَةُ مَعْرِفَةُ الْحَقِّ وَالْعَمَلُ بِهَا مَعْرِفَةٌ ،

–খোদা পরিচিতিই হল পুঞ্জিভূত হিকমত। আর সত্যের জ্ঞান লাভ করে তদনুযায়ী আমল করা হচ্ছে বাতিনের মারিফাত।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো এরশাদ করেছেন–

اَللّٰهُمَّ اَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اِتِّبَاعَهُ ، وَاَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلاً وَارْزُقْنَا اِجْتِنَابَه ،

–হে আল্লাহ! আমাদের নিকট সত্যকে সত্যরূপে প্রকাশ করুন এবং সেটার উপর আমল করার সামর্থ দান করুন। আর মিথ্যাকে মিথ্যারূপে প্রকাশ করুন এবং তা থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন।[১]

---

১. ইবনে কাসীর : তাফসীর-ই ইবনে কাসীর, ১/৫৭১; হক্কী : তাফসীর-ই হক্কী, ১০/১৫২; তাহাভী : আল ওসীত, ১/৩৬৬;

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন–

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ وَ خَالِقَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ وَتَابِعَهُ ،

–যে ব্যক্তি নিজকে ও তার প্রতিপালককে চিনেছে সে তার রবের পরিচয় লাভ করেছে এবং তার অনুগত হয়েছে।

আর 'বিশেষ মানুষ' নিজের মূল ঠিকানায় পৌঁছে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করেন। আর এটা প্রাপ্তির মাধ্যম হল ইলমে হাকীকত। নৈকট্যের-জগত (عالم قربت) আলমে-লাহূতের তাওহীদের নাম। পার্থিবজীবনে নিজ আমল ও অভ্যাসের মাধ্যমে এ পদমর্যাদা অর্জন করা যায়। 'বিশেষ মানুষ'র শয়ন ও জাগরণ উভয় সমান। রবং যখন শরীর ঘুমায় তখন এ কলব (অন্তর)'র বিশ্রামের সুযোগ হয়। তখন তা স্ব-শরীরে কিংবা আংশিকভাবে মূল ঠিকানায় পৌঁছে যায়। যেমন আল্লাহ্ তা'আলার বাণী–

ٱللَّهُ يَتَوَفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَٱلَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا ﴿٤٢﴾

'আল্লাহ্ প্রাণগুলোকে ওফাত দান করেন তাদের মৃত্যুর সময়। আর যারা মৃত্যুবরণ করে না তাদেরকে তাদের নিদ্রাবস্থায়।[১]

এ জন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন–

نَوْمُ الْعَالِمِ خَيْرٌ مِّنْ عِبَادَةِ الْجَاهِلِ ،

–আলিমের নিদ্রা মুর্খের ইবাদত অপেক্ষা উত্তম।

আর তা এ জন্য যে, তাঁদের অন্তর তাওহীদের জ্যোতিতে সজীব থাকে এবং তাঁরা বাতিনী রসনা দ্বারা নিঃশব্দে সর্বদা আল্লাহর নামসমূহের যিক্‌রে ব্যাপৃত থাকেন। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা হাদীসে কুদসীতে এরশাদ করেন–

اَلْإِنْسَانُ سِرِّيْ وَاَنَا سِرُّهُ ،

–মানুষ আমার গুপ্তভেদ আর আমি তার গুঢ় রহস্য।

(হাদীসে কুদসীতে) আরো এরশাদ করেন–

اِنَّ عِلْمَ الْبَاطِنِ سِرٌّ مِّنْ سِرِّيْ اَجْعَلُهُ فِيْ قَلْبِ عِبَادِيْ وَلَايَقِفُ عَلَيْهِ اَحَدٌ غَيْرِيْ

[১]. আল কুরআন : সূরা যুমার, ৩৯/৪২

–বাতিনী ইলম আমার গুপ্তরহস্যগুলোর মধ্যে একটি গুপ্তরহস্য, যা আমি আমার বিশেষ বান্দাদের অন্তকরণে রেখেছি, আর আমি ব্যতীত কেউ ওই গুপ্তভেদ সম্পর্কে অবগত নয়।

হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন–

اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيْ بِيْ وَاَنَا مَعَهُ حِيْنَ يَذْكُرُنِيْ اِنْ ذَكَرَنِيْ فِيْ نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِيْ نَفْسِيْ وَاِنْ ذَكَرَنِيْ فِيْ مَلَإٍ ذَكَرْتُهُ فِيْ مَلَإٍ اَحْسَنُ مِنْهُ ،

–আমি আমার বান্দার ধারণানুযায়ী আচরণ করে থাকি এবং তার সাথে থাকি। যখন সে আমাকে স্মরণ করে আমিও তাকে স্মরণ করি। যদি সে আমাকে অন্তরে স্মরণ করে তখন আমিও তাকে আপন শানানুযায়ী আমার নিজের মধ্যে স্মরণ করি। আর যদি সে আমাকে কোন সমাবেশে (সম্মিলিতভাবে) স্মরণ করে তখন আমিও তাকে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট সমাবেশে (ফেরেশতাদের মজলিসে) স্মরণ করি।[১]

নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমান–

تَفَكُّرُ سَاعَةً خَيْرٌ مِّنْ عِبَادَةِ سَبْعِيْنَ سَنَةً ،

–আল্লাহ্ তা'আলার ধ্যানে নিমগ্ন একটি মুহূর্ত সত্তর বছরের ইবাদত অপেক্ষা উত্তম।

আরো এরশাদ করেন–

تَفَكُّرُ سَاعَةٍ خَيْرٌ مِّنْ عِبَادَةِ اَلْفِ عَامٍ ،

–আল্লাহর যাতের ধ্যানের একটি মুহূর্তের মর্যাদা হাজার বছর ইবাদতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

ইলম এমন একটি পরিচয়জ্ঞান (عرفان) যা আল্লাহ্ তা'আলার একত্ববাদের (واحدنية) পরিচয় লাভের মাধ্যম হয়ে থাকে। যেটার মাধ্যমে খোদাতত্ত্ব-জ্ঞানীরা (আল্লাহর) নৈকট্যের মর্যাদা পেয়ে যায়। অতঃপর ইবাদতকারী ও তত্ত্বজ্ঞানীরা সকল প্রকার নৈকট্যের মর্যাদায় আত্মহারা ও বিভোর থাকে। এ প্রসঙ্গে কবি বলেন–

[১]. ক. বোখারী : আস সহীহ, কিতাবুত তাওহীদ, হাদীস : ৬৯৭০;
খ. মুসলিম : আস সহীহ, কিতাবুয যিকরী ওয়াদ্ দোয়া, হাদীস : ২৬৭৫

قُلُوْبُ الْعَاشِقِيْنَ لَهَا عُيُوْنٌ تَرَى مَا لاَ يَرَاهَا النَّاظِرُوْنَ
لَهَا اَجْنِحَةٌ تَطِيْرُ بِغَيْرِ رِيْشٍ اِلَى مَلَكُوْتِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

–প্রেমিকদের হৃদয়পটে এমন কতিপয় চক্ষু রয়েছে, যা এমন সব বস্তু দর্শন করে যা সাধারণ চক্ষুষ্মানরা দেখতে পায় না। আর তাদের এমন কতগুলো পালকহীন ডানা রয়েছে, যা দ্বারা তারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিপালকের রাজ্যসমূহ বিচরণ করে বেড়ায়।

খোদাতত্ত্ব-জ্ঞানী বিশিষ্ট ব্যক্তিদের এ উড্ডীয়ন বাতিনী জগতে হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে তাকেই মানুষ বলা হয়েছে। সে-ই আল্লাহর প্রেমিক। তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু ও 'আরূস' (عروس)। যেমন, হযরত বায়েজীদ বোস্তামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আহলুল্লাগণই আল্লাহর আরূস। একান্ত মুহরিম ব্যতীত যেমন আরূসকে (নবদুলহান) কেউ চিনতে পারে না তেমনি তাঁরাও মানবীয় পোশাকে আবৃত ও লুকায়িত থাকেন, তাঁদের সম্পর্কে আল্লাহ ব্যতীত কেউই জানে না। হাদীসে কুদসীতে রয়েছে–

اَوْلِيَائِيْ تَحْتَ قُبَائِيْ لاَيَعْرِفُهُمْ غَيْرِيْ ،

–আমার ওলীগণ আমার কুদরতের চাদরের নীচে আবৃত, তাদেরকে আমি ব্যতীত কেউ চিনে না।[১]

লোকেরা তো তাঁদের বাহ্যিক শোভা-সৌন্দর্য বৈ কিছুই দেখতে পায় না। হযরত ইয়াহয়া বিন মুয়ায রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম বলেন–

اَلْوَلِيُّ رَيْحَانُ اللهِ فِيْ اَرْضِهِ يَشُمُّهُ الصِّدِيْقُوْنَ ،

আল্লাহর ওলী এ বিশ্ব বাগানের প্রস্ফুটিত পুষ্প, যার সৌরভ সিদ্দীকগণই লাভ করে।

যখন তাঁদের সুগন্ধি সিদ্দীকদের অন্তকরণে ছড়িয়ে পড়ে তখন তাঁদের আবেগ ও আগ্রহ আল্লাহর প্রেমে ধাবিত ও আপ্লুত হয়ে আত্মহারা হয়ে যায় আর তাঁদের ইবাদত তাঁদের চারিত্রিক উন্নতি ও ফানা'র পদমর্যাদা অনুযায়ী বৃদ্ধি পেয়ে যায়। এ জন্য যে, যত বেশি সান্নিধ্য লাভ হয় তত বেশি ফানার পদমর্যাদা বৃদ্ধি পায়। অতএব প্রমাণিত হল যে, ওলী হলেন ঐ সৌভাগ্যবান

[১]. মোল্লা আলী কারী : মিরকাতুল মাফাতীহ, ১৫/২৫৬

ব্যক্তি যে স্বীয় অস্তিত্ব বিলীন করে দেয় এবং খোদা তা'আলার দর্শনে তার মি'রাজ লাভ হয়। তাতে না তার নিজের কোন স্বাধীনতা থাকে আর না সে আল্লাহর সঙ্গ ব্যতীত অন্য কিছুতে প্রশান্তি লাভ করে। এভাবেই মানুষ কারামতের মাধ্যমে স্বীকৃত হয় এবং সাধারণ লোকদের থেকে পৃথক, স্বতন্ত্র ও স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়। আর কারামত হল এমন বস্তু (গুপ্তভেদ) যা প্রকাশ করা সঙ্গত নয়। কারণ, মহান রবের গূঢ় রহস্যগুলো প্রকাশ করা কুফরী। 'মেরসাদ' নামক গ্রন্থে রয়েছে, কারামত প্রদর্শনকারী পর্দার অন্তরালে (গোপনে) থাকে এবং বিশেষ ওলীদের জন্য কারামত প্রদর্শন করা (পুরুষদের) ঋতুস্রাবের ন্যায় (অস্বাভাবিক)। বিলায়তের হাজার হাজার মকাম ও স্তর রয়েছে, তন্মধ্যে সর্বপ্রথম স্তরটি হল 'কারামতের স্তর' (অলৌকিক কার্যাবলী প্রদর্শনের স্তর)। যে এটি অতিক্রম করেছে সে যেন অবশিষ্ট স্তরসমূহ অতিক্রম করে ফেললো। (অর্থাৎ সে খোদাপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে বঞ্চিত হওয়া থেকে নিরাপদ হয়ে গেল। আর যখন কেউ মূল ফটকেই প্রবেশ করলো না, সে কি অর্জন করতে পারবে?)।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মানুষ ও নিম্ন থেকে নিম্নতরস্তর

আল্লাহ তা'আলা রূহে-কুদসীকে আলমে-লাহুতে সুনিপুণ ও সুন্দর আকৃতিতে সৃষ্টি করলেন। অতঃপর তাকে নিম্ন থেকে নিম্নতর স্তর (اسفل السافلين)এ ফিরিয়ে দিতে ইচ্ছা করলেন। যাতে প্রেম আকাঙ্খা ও আবেগের আধিক্য দ্বারা সিদকের মহান পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত করা যায়, যা মহান আল্লাহর সান্নিধ্য ও নৈকট্যের মাধ্যম হবে। আর এ পদমর্যাদা সম্মানিত নবী ও ওলীদের জন্য বিশেষভাবে স্বীকৃত।

প্রথমে ওটাকে (রূহে-কুদসীকে) তাওহীদের বীজসহ আলমে-জাবারুতে (عالم جبروت) প্রেরণ করা হয়। অতঃপর জ্যোতির জগত (عالم نورانيت) থেকে জড় জগতের (عالم ناسوت) জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়। এরপর এটাকে ওই জগতের বস্ত্রাবৃত করা হয়। অতঃপর পৃথিবীর জগতে (عالم ملك) প্রেরণ করা হয়। তারপর ওটার জন্য উপাদান চতুষ্টয় (আগুন, পানি, মাটি ও বাতাস)'র পোশাক তৈরী করা হয়। যেন পৃথিবী জগত (عالم ملك)-এ অপবিত্র কায়া জ্বলে ভস্মীভূত না হয়।

জাবারূতী পোশাক অনুযায়ী এ রূহের নাম রূহে-সুলতানী, আলমে মালাকুতীর দৃষ্টিকোণে এটার নাম রূহে-সায়রানী ও রাওয়ানী, আর আলমে মূল্‌কের পোশাকের দৃষ্টিকোণে এটার নাম রূহে জিসমানী (কায়িক আত্মা) রাখা হয়।

এ নিম্নজগতে প্রেরণের উদ্দেশ্য হল যে, মানুষ হৃদয় ও কায়ার মাধ্যমে অধিকতর সান্নিধ্যের মর্যাদার অধিকারী হবে এবং আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য আপন অন্তরে তাওহীদের বীজ বপন করবে, যাতে তার আত্মার লীলাভূমিতে তাওহীদ বৃক্ষ জন্ম লাভ করে। যেটার মূল পৃথিবী পৃষ্ঠে বৃদ্ধি পেয়ে তাওহীদের ফল-ফুলে সুশোভিত হয়ে যায়। অতঃপর শরীয়তের বীজ কলবে বপন করা হবে, যেন তাতে শরীয়তের বৃক্ষ অঙ্কুরিত হয় এবং সুউচ্চ মর্যাদার ফল উৎপন্ন করে। এজন্য আল্লাহ তা'আলা রূহগুলোকে কায়া বা দেহ কাঠামোতে প্রবেশের নির্দেশ দিলেন এবং প্রত্যেকের জন্য পৃথক পৃথক পদমর্যাদা ও পজিশন নির্ধারণ করে দিলেন। সুতরাং মানবীয় আত্মার অবস্থান

হল রক্ত ও মাংসের মধ্যখানে আর রূহে-কুদসীর অবস্থান হল লতীফায়ে সিররে। সুফীদের পরিভাষায় এটি একটি স্থানের নাম, যাকে 'সির' নামে নামকরণ করা হয়েছে। যা রূহের প্রকাশস্থল। যেটা রূহ ও মাংসের মধ্যবর্তী স্থানে রয়েছে। এ উভয়ের (রূহে ইনসানী ও রূহে কুদসীর) প্রত্যেকটির অস্তিত্বে একেকটি শহর ও একেকটি বিশালাকার স্থান রয়েছে, সেখানে বাণিজ্যের পণ্য রয়েছে আর তাতে রয়েছে প্রবৃদ্ধি ও লাভ। ঐ শহর ও ঐ ভূমিতে এমন বাণিজ্যের ধারা প্রতিষ্ঠিত যে, যাতে কখনো বিনষ্ট, ক্ষতিগ্রস্থ ও রুদ্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা নেই। আল্লাহ তা'আলার বাণী–

سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَٰرَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٩﴾

–যারা আমার প্রদত্ত সম্পদ থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করতে থাকে, তারা এমন বাণিজ্যের আশা রাখে যাতে কখনো ক্ষতি ও লোকসানের আশঙ্কা নেই।[১]

প্রত্যেক মানুষের স্বীয় অস্তিত্ব ও সত্তার অর্থাৎ তার সৃষ্টির অন্তর্নিহিত দিক সম্পর্কে জ্ঞান রাখা অত্যাবশ্যক। কেননা, এখানে যা কিছুই (ভাল কিংবা মন্দ) অর্জিত হবে, তা তার জন্য গলার হার হবে এবং তা তার দায়িত্বে অর্পণ করা হবে। আল্লাহ তা'আলার বাণী–

أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي ٱلْقُبُورِ ﴿٩﴾ وَحُصِّلَ مَا فِي ٱلصُّدُورِ

–মানুষ কি সে সম্পর্কে অবগত নয় যে, যখন কবর থেকে উঠানো হবে এবং যা কিছু তাদের অন্তরে রয়েছে তা প্রকাশ করা হবে।[২]

আরো এরশাদ করেন–

وَكُلَّ إِنسَٰنٍ أَلْزَمْنَٰهُ طَٰٓئِرَهُۥ فِي عُنُقِهِۦ ﴿١٣﴾

–প্রত্যেক মানুষের আমলনামা তার ঘাড়ে ঝুলিয়ে দিয়েছি।[৩]

---

১. আল কুরআন : সূরা ফাতির, ৩৫/২৯
২. আল কুরআন : সূরা আদিয়াত, ১০০/৯-১০
৩. আল কুরআন : সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭/১৩

তৃতীয় অধ্যায়

কায়িক শহর ও রূহানী বাণিজ্যালয়

কায়ার শহরে রূহানী বাণিজ্যালয় পাওয়া যায়। যেটার অবস্থান হল বক্ষদেশ ও বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। আর এটার মূলধন হল শরীয়ত। এবং বাণিজ্যনীতি হল শরীয়তের উপর আমল করা, যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের উপর ফরয বা অত্যাবশ্যক করেছেন। ঐসব কর্মকাণ্ডে অংশীদার রীতি প্রবিষ্ট হয় না। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ أَحَدًۢا ﴿١١٠﴾

–এবং সে যেন আপন প্রতিপালকের ইবাদতে কাউকে অংশীদার না করে।[১]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন,

إِنَّ اللهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ،

–আল্লাহ একক এবং তিনি একত্বকেই পছন্দ করেন।[২]

এমন আমল যা লৌকিকতা, অন্যকে শুনানো, সামাজিকতা ও কপটতা থেকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হয়। এ প্রকার নিষ্ঠাপূর্ণ আমলের ফল হচ্ছে পৃথিবীর নিম্নতর স্তর (تحت الثرة) থেকে আসমান পর্যন্ত আল্‌মে মুলুকের বিলায়ত। এ জন্য পানির উপর চলা, বাতাসে উড়া, ক্ষণিকের মধ্যে একস্থান থেকে অন্যস্থানে চলে যাওয়া, অতিদূর থেকে শুনে নেয়া, বাতিনীভাবে গুপ্তভেদসমূহ অবগত হওয়া ও প্রকাশ করা ইত্যাদি এগুলো মারিফাতপন্থীদের কাছে বিলায়তের অন্তর্ভুক্ত নয় বরং রাহবানিয়্যত (বৈরাগ্যবাদ)-এর পদমর্যাদার অধিভুক্ত। সুতরাং পরজগতে ঐসব (নিষ্টাপূর্ণ) আমলের প্রতিদান স্বরূপ জান্নাত, হুর, বালাখানা, খাদেম, পবিত্র পানীয় ও অন্যান্য নেয়ামতরাজি রয়েছে, যেগুলো জান্নাতের প্রাথমিক উপকরণ, যেটাকে 'জান্নাতুল মাওয়া' দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

[১]. আল কুরআন : সূরা কাহফ, ১৮/১১০

[২]. তিরমিযী : আস্ সুনান, ২/২৫৫; ইবনে মাজাহ : আস্ সুনান, ৪/৬; তাবরিযী : মিশকাত, باب الوتر পৃ ২৮১;

রূহানী শহর ও রূহানী দোকান

রূহে-রওয়ানীর স্থান হল কলব। আর এটার উপকরণ ও পাথেয় হল তরীকতের জ্ঞান, এটার বাণিজ্য হল বারটি মৌলিক নামের প্রথম চারটি নামের যিকরে তন্ময় থাকা। তা এরূপ যে, তাতে বর্ণ ও ধ্বনির কোন স্বতন্ত্রক্রিয়া থাকবে না। যেমন, এরশাদ হয়েছে–

قُلِ ٱدْعُوا۟ ٱللَّهَ أَوِ ٱدْعُوا۟ ٱلرَّحْمَـٰنَ ۖ أَيًّا مَّا تَدْعُوا۟ فَلَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ ۚ،

–হে হাবীব! আপনি বলে দিন যে, আল্লাহকে আল্লাহ নামে আহ্বান কর কিংবা রহমান নামে, যা বলেই আহ্বান কর সবই তাঁর সুন্দর সুন্দর নাম।[১]

আরো এরশাদ হয়েছে–

وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا ۖ ﴿١٨٠﴾

–আল্লাহর অনেক সুন্দর নাম রয়েছে, অতএব তোমরা তাঁকে ওই সব নামেই ডাকো।[২]

উক্ত আয়াতদ্বয় থেকে প্রতীয়মান হল যে, আল্লাহর উত্তম নামসমূহ হল কলবের ওযীফা, যা ইলমে বাতেনের পর্যায়ভুক্ত। আর আল্লাহর নামসমূহের পরিচয় লাভ করা হল তাওহীদে বিশ্বাসের প্রতিফল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন–

إِنَّ اللهَ تَعَالٰى تِسْعَةٌ وَّ سَبْعُوْنَ اَسْمَاءً مَنْ اَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ،

–নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলার নিরানব্বইটি নাম রয়েছে। যে এগুলো মুখস্থ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

আরো এরশাদ করেছেন, আলিফ একটি বর্ণ। আর এটার পুণরাবৃত্তি (تكرار) করা যেন একহাজারটি বর্ণ (অর্থাৎ বার বার এ বর্ণ তিলাওয়াতে সাওয়াবও হাজার গুণ বৃদ্ধি পাবে)। এখানে গণনার উদ্দেশ্য হল যেন মানুষ ঐসব নামের

[১]. আল কুরআন : সূরা বনী ইস্রাঈল, ১৭/১১০

[২]. আল কুরআন : সূরা আ'রাফ, ৭/১৮০

গুণে গুণান্বিত হওয়ার চেষ্টা করে। আর এ বারটি নাম কালেমায়ে তাওহীদের বারটি বর্ণের সমান, যেগুলোকে 'আসমায়ে উসূল' নামে আখ্যায়িত করা হয়। উসূল শব্দের অর্থ মূলভিত্তি। অধিকন্তু ঐ নামসমূহের বিভিন্ন আধ্যাত্মিক (বাতিনী) প্রভাবের ক্ষেত্রে প্রতিটি বর্ণের জন্য একেকটি নাম নির্ধারিত আছে। আর প্রতিটি জগতের জন্য তিনটি নাম রয়েছে। যেগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা প্রেমিকদের হৃদয়ে দৃঢ়তা দান করেছেন। যেমন এরশাদ হয়েছে–

يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِى ٱلْأَاخِرَةِ ﴿٢٧﴾

–আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারকে ইহ ও পারলৌকিক জীবনে শাশ্বত বাণী তথা সত্য ও ন্যায়ের উপর অবিচল রাখবেন।[১]

আল্লাহ তা'আলার তাওহীদ বৃক্ষ যেটার শিকড় সপ্তযমীন থেকেও নিচে বরং তদপেক্ষাও নিম্নে 'সারা' নামক স্থানে এবং সেটার শাখা-প্রশাখা আসমানে মহান আরশের চেয়েও সুউচ্চে। মহান রবের বাণী–

كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِى ٱلسَّمَآءِ ﴿٢٤﴾

–এটার উপমা তো একটি পবিত্র বৃক্ষ, যার মূল যমীনে সুদৃঢ় আর শাখা- প্রশাখা আসমানে।[২]

রূহে-রাওয়ানীর ফয়েয ও উপকার হায়াতে কলবীর অন্তর্ভুক্ত। রূহে রাওয়ানীর জীবন অর্থাৎ সজীবতা আলমে মালাকুতে দৃষ্টিগোচর হয়। অর্থাৎ বেহেশত, বেহেশতবাসীর কর্মকাণ্ড, ফেরেশতা ও অন্যান্য জ্যোতির তাজাল্লী দর্শন করে থাকে। এ ছাড়া ঐসব নাম যেগুলো ধ্বনি ও বর্ণ সম্বলিত হয়, সেগুলো দর্শন করে। অতঃপর হালের ভাষায় আলোচিত হয়। অর্থাৎ বাতিনীভাবে আলোচনায় উপযুক্ত হয়ে যায়। অতঃপর পরজগতে তার ঠিকানা অন্য একটি জান্নাতে হয়ে থাকে, যাকে জান্নাতুন নায়ীম বলা হয়।

[১]. আল কুরআন : সূরা ইবরাহীম, ১৪/২৭
[২]. আল কুরআন : সূরা ইব্রাহিম, ১৪/২৪

রূহে-সুলতানী

রূহে সুলতানীর বাণিজ্যালয় হল অন্তর। এটার মূলধন হচ্ছে (আল্লাহর) মারিফাত। এর সম্বন্ধ অন্তরের রসনার সাথে। যেটার যিক্‌র সর্বদা চারটি মধ্যম পর্যায়ের নাম দ্বারা হয়ে থাকে। যেভাবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন–

اَلْعِلْمُ عِلْمَانِ : عِلْمٌ عَلَى اللِّسَانِ ، فَذٰلِكَ حُجَّةُ اللهِ عَلٰى خَلْقِهِ ، وَعِلْمٌ بِالْجَنَانِ

فَذٰلِكَ الْعِلْمُ النَّافِعُ لِاَنَّ اَكْثَرُ مَنَافِعُ الْعِلْمِ فِيْ هٰذِهِ الدَّائِرَةِ ،

–ইলম দু'প্রকার। এক প্রকার হল যেটার সম্বন্ধ রসনার সাথে। এটা সৃষ্টির জন্য আল্লাহ তা'আলার দলীল স্বরূপ। দ্বিতীয় প্রকার ইলম যেটার সম্পর্ক অন্তরের সাথে, এটা উপকারী ইলম। কেননা, এটার উপকারের পরিসীমা সু-প্রশস্ত ও উপকার অনেক।[১]

নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো এরশাদ করেন–

اِنَّ لِلْقُرْآنِ ظَهْرًا وَبَطْنًا وَلِبَطْنِهٖ بَطْنًا اِلٰى سَبْعَةِ اَبْطَنٌ ،

–কুরআনের বাহ্যিক (ظـــاهري) শব্দ ও অর্থ যেমন রয়েছে তেমনি গোপন ও অন্তর্নিহিত (بـــاطني) মর্মার্থও রয়েছে। আর অন্তর্নিহিত অর্থে রয়েছে গুপ্তভেদ ও গূঢ় রহস্য।[২]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন,

اِنَّ اللهَ اَنْزَلَ الْقُرْاٰنَ عَلٰي عَشَرَةِ اَبْطَنٍ ،

আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদকে দশটি বাতিনী রহস্যের উপর অবতীর্ণ করেছেন। আর এর প্রত্যেকটিই অত্যন্ত উপকারী। আর ঐসব নিগূঢ় রহস্য হল কুরআনের মগজ বা সারবস্তু।

বারটি আসমায়ে উসূল (মৌলিক নাম)

এ বারটি মৌলিক নাম ঐ বারটি ঝর্ণাধারার দৃষ্টান্তস্বরূপ যা হযরত মূসা আলাইহিস সালামের লাঠি মোবারকের আঘাতে প্রবাহিত হয়েছিল। যেভাবে এরশাদ হয়েছে–

[১]. বায়হাকী : সুয়াবুল ঈমান, ৪/৩৪২
[২]. হক্কী : তাফসীর-ই হক্কী, ১/৯১;

فَقُلْنَا ٱضْرِب بِّعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ ۖ فَٱنفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۖ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ﴿٦٠﴾

—অতঃপর আমি তাকে বললাম, তোমার লাঠি দ্বারা প্রস্তর খণ্ডে আঘাত কর (অতঃপর তিনি লাঠি দ্বারা আঘাত করলেন) তখন বারটি ঝর্ণা প্রবাহিত হয়ে গেল এবং প্রত্যেক সম্প্রদায় স্ব-স্ব ঘাট চিনে নিল।[১]

ইলমে জাহের (প্রকাশ্য জ্ঞান) বৃষ্টির পানির ন্যায় ক্ষণস্থায়ী। পক্ষান্তরে ইলমে বাতেন (গুপ্তজ্ঞান) হল জ্ঞানের উৎস। কারণ, এ জ্ঞান বাহ্যিক জ্ঞানের তুলনায় অধিক উপকারী। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন—

وَءَايَةٌ لَّهُمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَٰهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿٣٣﴾

—তাদের জন্য মৃত ভূমি একটি নিদর্শন। আমি সেটাকে জীবিত করেছি, এরপর তা থেকে শস্য উৎপন্ন করেছি। অতঃপর তা থেকে তারা আহার করে।[২]

আল্লাহ তা'আলা জমি থেকে শস্য উৎপন্ন করেন যা মানব জীবনের জন্য শক্তি সঞ্চারক। আর এমন খাদ্যও উৎপন্ন করেন, যা আত্মার আত্মিক শক্তির কারণ হয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন—

مَنْ أَخْلَصَ لِلّٰهِ أَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا ظَهَرَتْ يَنَابِيْعُ الْحِكْمَةِ مِنْ قَلْبِهِ عَلٰى لِسَانِهِ ،

—যে ব্যক্তি একাগ্রচিত্তে চল্লিশ দিন আল্লাহর উদ্দেশ্যে ইবাদত করবে (যাতে কোন কপটতা থাকবে না) তবে তার অন্তকরণ থেকে হিকমত বা জ্ঞান-বিজ্ঞানের ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে, যা তার রসনায় প্রকাশ পাবে।[৩]

আর রুহে-সুলতানীর ব্যবসার মুনাফা হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলার জামালিয়াতের প্রতিবিম্বের দর্শন লাভ করা। যেমন, আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন—

---

১. আল কুরআন : সূরা বাকারা, ২/৬০
২. আল কুরআন : সূরা ইয়াসীন, ৩৬/৩৩
৩. মোল্লা আলী কারী : মিরকাতুল মাফাতীহ, ৪/৭২; মাসনাদুশ শিহাবিল কাযায়ী : ২/২৬১

مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ﴿١١﴾

—অন্তকরণ যা কিছু দর্শন করেছে তা মিথ্যা নয়।[১]

অর্থাৎ নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা কিছু (মি'রাজ রজনীতে) স্বচক্ষে দর্শন করেছেন, অন্তর সেগুলোর সত্যায়ন করেছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন—

اَلْمُؤْمِنُ مِرْآةُ الْمُؤْمِنِ

—মুমিন মুমিনের দর্পণ স্বরূপ।[২]

এখানে প্রথম মু'মিন (مؤمن) শব্দ দ্বারা ঈমানদার ব্যক্তি ও দ্বিতীয় মু'মিন (مؤمن) শব্দ দ্বারা আল্লাহর মহান সত্তা উদ্দেশ্য। যেমন, আল্লাহ তা'আলার বাণী—

ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيْمِنُ ﴿٢٣﴾

—আল্লাহ তা'আলা ঈমানদানকারী ও ঈমানের রক্ষক।[৩]

এ দু'টি আল্লাহ তা'আলার সুন্দরতম নামসমূহের অন্তর্ভুক্ত। আর এ দলের আবাসস্থল হল জান্নাত। যেটাকে জান্নাতুল ফিরদাউস বলা হয়।

রূহে-কুদসী

রূহে-কুদসীর বাণিজ্যকেন্দ্র হচ্ছে 'সির' নামক লতীফা। হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

اَلْإِنْسَانُ سِرِّيْ وَاَنَا سِرُّهُ ،

—মানবজাতি আমার গোপনরহস্য এবং আমি তার গোপনরহস্য।

এ রহস্যের মূলধন হল হাকীকতের জ্ঞান ও তাওহীদ সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া। এর ব্যবসার মূলকেন্দ্রবিন্দু হল লতীফায়ে সির'র রসনা, যার বাক্যালাপের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। আর এর যাবতীয় বাণিজ্য ও লেনদেন তাওহীদের মূলতত্ত্বের উপর হয়ে থাকে।

---

১. আল কুরআন : সূরা নাজম, ৫৩/১১
২. তিরমিযী : আস্ সুনান, ১৩/৭৬; তাবরিয়ী : মিশকাত, বাবুস্ সালাম, পৃ. ৮০
৩. আল কুরআন : সূরা হাশর, ৫৯/২৩

তাওহীদের অবশিষ্ট নামসমূহ

তাওহীদের মূলনাম চারটি. যেগুলোর সিরের জিহ্বার সাথে ধ্বণিহীন সম্বন্ধ রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَإِن تَجْهَرْ بِٱلْقَوْلِ فَإِنَّهُۥ يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ وَأَخْفَى ۝٧

–যদি তুমি উচ্চকণ্ঠে কথা বলো, তবে নিশ্চয় তিনি তো গুপ্ত ও অব্যক্ত সকলই জানেন।[১]

সুতরাং আল্লাহ ছাড়া কেউ এ সম্বন্ধে অবগত নয়। রূহে-কুদসীর বাণিজ্যিক ফায়েদা হল তিফলুল মা'আনীর বহিঃপ্রকাশ, আল্লাহর দর্শন ও সাক্ষাত লাভ এবং ঐদিন লতীফায়ে সির'র চক্ষু দ্বারা আল্লাহ তা'আলার প্রতাপশালী (جلالي) ও কমনীয়তার (جمالي) রূপ দর্শন করা। যেদিন কিছু চেহারা সজীব হবে এবং আপন প্রতিপালককে বিনা পর্দা, উপমাহীন ও অনস্থির চিত্তে দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করবে। মহান রবের বাণী–

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ۝٢٢ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ۝٢٣

–যেদিন কোন কোন মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে, তারা তাদের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে।[২]

আর ঐ মহিমাময় সত্তা তুলনা ও উপমাহীন–

لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَىْءٌ ۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۝١١

–তাঁর সদৃশ কিছুই নেই, তিনি শুনেন ও দেখেন।[৩]

যখন মানুষ নিজ মূল লক্ষ্যস্থল ও গন্তব্য পেয়ে যায়, তখন বিবেক হতবাক হয়ে পড়ে, অন্তর হতবাক হয়ে পড়ে ও রসনা মূক হয়ে যায় এবং মানুষ তাঁর দর্শনের অবস্থা বর্ণনায় অক্ষম হয়ে পড়ে। কারণ, আল্লাহ তা'আলা তুলনা, দৃষ্টান্ত ও উপমার রূপ থেকে পূত-পবিত্র আর বিজ্ঞ আলেমদের জন্য আবশ্যক হল যে, যখন তারা ঐসব নিগুঢ় রহস্যের ব্যাপারে অবগত হবে, যা এখানে বর্ণিত হয়েছে, তখন তা অস্বীকার করবে না বরং বাতিনী ইলমের স্তরসমূহ

১. আল কুরআন : সূরা তোয়াহা, ২০/৭
২. আল কুরআন : সূরা কিয়ামাহ, ৭৫/২২-২৩
৩. আল কুরআন : সূরা শূরা, ৪২/১১

পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করবে। এগুলোর গুঢ়রহস্য ও হাকীকত সম্বন্ধে চিন্তা-গবেষণা করবে এবং সুউচ্চ মর্যাদার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে হাকীকতের সর্বোচ্চ চূড়ায় আরোহণের চেষ্টা করবে, যেন ইলমে লাদুন্নী ও খোদাতত্ত্ব জ্ঞানের পূর্ণতা অর্জিত হয়।

চতুর্থ অধ্যায়

জ্ঞানের সংখ্যা

ইলমে জাহের (প্রকাশ্য জ্ঞান) বারটি শ্রেণীতে বিভক্ত। একইভাবে ইলমে বাতেন (গুপ্তজ্ঞান)-এরও বারটি প্রকার রয়েছে, যা সাধারণ (عام) ও বিশিষ্ট (خاص) ব্যক্তির যোগ্যতার উপর নির্ভরশীল ও সীমাবদ্ধ। এগুলোকে নিম্নোক্ত শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে–

১. ইলমে শরীয়ত বা জাহেরী বিধানে কার্যাবলীর নীতিমালা। অর্থাৎ আজ্ঞা পালন, নিষেধকৃত বস্তু ও কর্ম থেকে বিরত থাকার শরয়ী বিধান।
২. ইলমে বাতেন বা গুপ্তজ্ঞান, যেটাকে আমি আল্লাহর সত্তার পরিচয় জ্ঞান (علم معرفت ذات) নামে নামকরণ করেছি।
৩. ইলমে বাতেন (গুপ্তজ্ঞান), যেটাকে আমি আল্লাহর গুণাবলীর পরিচয় জ্ঞান (علم معرف صفات) নামে নামকরণ করেছি।
৪. ঐ ইলম 'জ্ঞান' যা সমস্ত গুপ্ত জ্ঞানের মূলভিত্তি। যেটাকে আমি হাকীকত 'তত্ত্বীয় জ্ঞান' নামে নামকরণ করেছি।

উক্তসব ইলম অর্জন করা অপরিহার্য। কেননা, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন–

اَلشَّرِيْعَةُ شَجَرَةٌ وَالطَّرِيْقَةُ اَغْصَانُهَا وَالْمَرْفَةُ اَوْرَقُهَا وَالْحَقِيْقَةُ ثَمَرُهَا ،

–শরীয়ত হল বৃক্ষ, তরীকত সেটার শাখা-প্রশাখা, মারিফাত তার পত্র-পল্লব, আর হাকীকত হল সেটার ফল।

পবিত্র কুরআন উক্ত ইলমসমূহের সমষ্টি। কারণ, হেদায়ত ও পথনির্দেশের জন্য ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রত্যেক কিছুর প্রমাণ ও স্পষ্ট ইঙ্গিত তাতে পাওয়া যায়। 'মাজমা' কিতাবের গ্রন্থকার বলেন, ব্যাখ্যা (تفسير) সাধারণ লোকদের জন্য আর মর্মার্থ (تاويل)'র সম্বন্ধ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে। কারণ আলেমদের মধ্যে বিজ্ঞ (راسخ) আর রুসূখ (رسوخ) দ্বারা উদ্দেশ্য হল জ্ঞানে যাদের পরিপক্কতা অর্জিত হয়েছে। তারা জ্ঞানে এমন সুদৃঢ় হয় যেরূপ খেজুর বৃক্ষ সুদৃঢ় মূলের উপর দণ্ডায়মান থাকে। আর সেটার শাখা-প্রশাখা গগনচুম্বী হয়ে

যায়। আর এ দৃঢ়তা ঐ কালেমারই ফল যেটার বীজ অন্তরকে স্বচ্ছ করার পর হৃদয় অভ্যন্তরে বপন করা হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলার বাণী–

وَٱلرَّٰسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ ﴿٧﴾

–এবং যারা জ্ঞানে পরিপক্ক।[১]

আর الله ও الا কে সংযোজক অব্যয় (حرف عطف) দ্বারা একটিকে অপরটির সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

তাফসীরে কবীর প্রণেতা (ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন–

لَوْفَتَحَ هَذَا الْبَابُ لَانفَتَحَتْ اَبْوَابُ الْبَاطِنِ ، ثُمَّ الْعَبْدُ مَامُوْرٌ بِقِيَامِ الْاَمْرِ وَالنَّهِيِّ ، وَمَخَالِفَةُ النَّفْسِ فِيْ كُلِّ دَائِرَةٍ مِّنْ هَذِهِ الدَّوَائِرِ الْاَرْبَعِ فَالنَّفْسُ تَوَسْوِسُ فِي دَائِرَةِ الشَّرِيْعَةِ مِنَ الْمُخَالِفَاتِ ،

–যদি ইলমের এ দ্বার উন্মুক্ত করা যায় তাহলে গুপ্তজ্ঞানের সমস্ত দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায়। অতঃপর বান্দাগণ আল্লাহ তা'আলার আদেশ নিষেধ পালন করা এবং সীমানা চতুষ্টয়ের প্রত্যেকটি থেকে কু-প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণে আদিষ্ট হয়। অতঃপর শরীয়তের পরিসীমায় নফস যাবতীয় আদেশ-নিষেধের বিরুদ্ধাচরণের ক্ষেত্রে কুমন্ত্রনা দেয়। তারপর তরীকতের পরিসীমায় নফ্‌স দ্বীনি বিষয়ের পক্ষপাতের আড়ালে পথভ্রষ্ট করে, এমন কি বিলায়ত ও নবুওয়াত দাবী করতে প্রস্তুত করে দেয়।[২]

মারিফাতের গণ্ডিতে আল্লাহর জ্যোতি প্রাপ্ত হয়ে নফস মালিককে শিরকে-খফীতে পতিত করে রব দাবীর কুমন্ত্রণা দেয়। যেভাবে এরশাদ হয়েছে–

أَفَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَٰهَهُۥ هَوَىٰهُ ﴿٢٣﴾

[১]. আল কুরআন : সূরা আলে ইমরান, ৩/৭
[২]. ফখরুদ্দীন রাযী : তাফসীরে কবীর

–হে প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি কি তাকে দেখেছেন, যে ব্যক্তি স্বীয় প্রবৃত্তিকে উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে।[১]

আর হাকীকতের গণ্ডিতে শয়তান, নফস, এমনকি ফেরেশতাদেরও প্রবেশাধিকার নেই। কেননা ওই বৃত্তে আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্যসব কিছু জ্বলে ভস্মীভূত হয়ে যায়। তাই হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম আবেদন করেছিলেন–

لَوْ دَنَوْتُ اَنْمِلَةً لَاَحْتَرَقْتُ ،

–যদি আমি এক আঙ্গুলের অগ্রভাগ পরিমাণ অগ্রসর হই তবে জ্বলে ভস্মে পরিণত হব।

ওই সময় বান্দা শয়তান ও প্রবৃত্তি এ উভয়ের শত্রুতার কবল থেকে মুক্তি পায় এবং খাঁটি বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। পবিত্র কুরআনে শয়তানের বক্তব্য এভাবে উদ্ধৃত হয়েছে–

قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٢﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿٨٣﴾

–তোমার মহত্ত্বের শপথ! আমি সকলকে পথভ্রষ্ট করব, তবে তোমার নিষ্ঠাবান বান্দাগণ ব্যতীত।[২]

আর বান্দা যতক্ষণ হাকীকতের সীমায় পৌঁছে না ততক্ষণ মুখলিস বা খাঁটি বান্দা হতে পারে না। কারণ, মানবীয় গুণাবলী যেমন কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি তাজাল্লীয়ে যাত তথা আল্লাহর সত্তার জ্যোতি ও বিকিরণ ব্যতীত ধ্বংস হতে পারে না। এ ছাড়া আল্লাহর সত্তার মারিফত ব্যতীত মূর্খতার পর্দা দূর হতে পারে না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাকে বিশেষ কৃপায় মধ্যস্থতা ব্যতীত ইলমে লাদুন্নী শিক্ষা দেন আর ঐ শিক্ষার মাধ্যমে সে হযরত খিযির আলাইহিস সালামের ন্যায় আল্লাহর পরিচয় জ্ঞান লাভ করে এবং তাঁরই পবিত্র সত্তার শিক্ষায় সে ইবাদতে মগ্ন হয়ে যায়। অতঃপর ঐ পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়ে যায় যে, পবিত্র রূহসমূহ দর্শন করে এবং তার নিকট প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু

[১]. আল কুরআন : আল জাসিয়া, ৪৫/২৩
[২]. আল কুরআন : সূরা সোয়াদ, ৩৮/৮২-৮৩

তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিচয় জ্ঞানও অর্জিত হয়। এরপর সে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের সু-উচ্চ পদমর্যাদার প্রশংসাকারী হয়ে যায় এবং সম্মানিত নবীগণ তাকে অনন্ত মিলনে শুভ সংবাদ প্রদান করে। যেভাবে এরশাদ হয়েছে–

وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ﴿٦٩﴾

–আর তারাই উত্তম সঙ্গী।[১]

আর যে-ব্যক্তি ওই ইলমের মাধ্যমে মিলন ও সান্নিধ্যের সৌভাগ্যময় মর্যাদা অর্জন করতে পারেনি সে প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানী নয়, যদিও সে সহস্রাধিক পুস্তক পাঠ করে। কারণ, সে রূহানীয়তের পদমর্যাদা পায়নি। জাহেরী জ্ঞানের উপর আমলের বিনিময় হল জান্নাত, যেখানে আল্লাহর গুণাবলীর (সিফাতের) প্রতিবিম্ব প্রকাশ পায় মাত্র। এ জন্য জাহেরী জ্ঞানের মাধ্যমে কোন ব্যক্তি বিশেষ জ্ঞানী (خاص عالم) ও নৈকট্যের পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত হতে পারে না। কারণ, সেটা (রূহানী জগত) হল বিচরণের জগত। আর এ জ্ঞানী হল পাখি। পাখি তার দু'টি ডানা ব্যতীত উড্ডয়ন করতে পারে না। তাই যে মানুষ জাহেরী ও বাতিনী (প্রকাশ্য ও গুপ্ত উভয় প্রকার) জ্ঞানের উপর আমলকারী হয় তার জন্য ঐ জগতে বিচরণ করা সম্ভবপর হয়। হাদীসে কুদসীতে রয়েছে–

يَا عِبَادِيْ اِذَا اَرَدْتَ اَنْ تَدْخُلَ حَرَمِيْ فَلَاتَلْتَفِتْ اِلَى الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوْتِ وَالْجَبَرُوْتِ لِاَنَّ الْمُلْكَ شَيْطَانُ الْعَالِمِ ، وَالْمَلَكُوْتِ شَيْطَانُ الْعَارِفِ ، وَالْجَبَرُوْتِ شَيْطَانُ الْوَاقِفِ مَنْ رَضِيَ بِاَحَدٍ مِّنْهُمَا فَهُوَ مَطْرُوْدٌ عَنْهُ ،

–হে আমার বান্দা! যদি তুমি আমার হেরমে প্রবেশের আকাঙ্খা কর তাহলে ইহজগত, ফেরেশতাদের জগত ও জাবারুত কোনটির প্রতি লক্ষ্য করো না। কারণ ইহজগত আলেমদের জন্য, আলমে-মালাকুত (ফেরেশতাদের জগত) আরেফদের জন্য ও আলমে-জাবারুত তত্ত্ব জ্ঞানীদের জন্য শয়তানের স্থলাভিষিক্ত।

যে ব্যক্তি এ ত্রিজগতের কোন একটিই পছন্দ করে নিল সে আল্লাহর নৈকট্য লাভ থেকে বঞ্চিত হয়ে গেল। কিন্তু তাকে (জান্নাতের) পদমর্যাদা (مدارج)

[১]. আল কুরআন : সূরা নিসা, ৪/৬৯

থেকে বঞ্চিত করা হবে না। এমন সব লোক আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অনুসন্ধানী হয় কিন্তু তারা নৈকট্য লাভ করাতে পারে না। কারণ, তারা অন্যকিছু অনুসন্ধান করে বসেছে। এছাড়া তাদের একটি মাত্র ডানা মিলেছে অথচ উড্ডীয়নের জন্য দু'টি ডানার প্রয়োজন হয়। আল্লাহর নৈকট্য প্রত্যাশীদের এমন পুরস্কার ও প্রাচুর্য লাভ হয় যা কোন চক্ষু অবলোকন করেনি। আর না তা কোন কান শ্রবণ করেছে এবং না কারো ধ্যাণ-ধারণায় উপলব্ধি হতে পারে। তাদের জান্নাত হল আল্লাহর সংশ্রব ও নৈকট্যই। যেখানে হুর-গিলমানের ধারণা করা যায় না। মানুষের উপর আবশ্যক হল যে, সে তার ব্যক্তি সত্তার জ্ঞান অর্জন করা। আর প্রবৃত্তির তাড়নায় ঐসব কিছু দাবী করে বসবে না যেটার সে অধিকার রাখে না। যেভাবে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন–

رَحِمَ اللهُ اِمْرَئٌ مَنْ اَعْرَفَ قَدْرَهُ لَمْ يَتَعَدْ طَرَرُهُ يَحْفَظُ حِفْظَ لِسَانَهُ وَلَمْ يَضَعْ عُمْرَهُ،

–আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তির উপর অনুগ্রহ করেন যে নিজের হাকীকত সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেছে এবং সীমালঙ্গন করেনি, জিহ্বাকে সুসংযত রেখেছে এবং জীবনকে পাপকর্মে বিনষ্ট করেনি।

আলিমের জন্য অত্যাবশ্যক হল যে, মানবীয় হাকীকতের মর্মার্থ যেটাকে 'তিফলুল মা'আনী' নামে নামকরণ করা হয়েছে তা অর্জন করা এবং তাওহীদের নামসমূহের নিরন্তর জিকির করে সেটার প্রতিপালন করা। কায়িকজগত (عالم احسام) থেকে বের হয়ে আধ্যাত্মিকজগতের (عالم روحانية) উন্নতি লাভে ব্রত হওয়া। আর এটা হল রহস্যেরজগত (عالم سر)। এখানে আল্লাহর সত্তা ব্যতীত কোন গণ্ডি ও প্রাচীর নেই। এটা জ্যোতির্ময় প্রান্তরের ন্যায় সীমা ও প্রান্তহীন এক জগত। তিফলুল মা'আনীতে প্রকৃত মানবরাই (حقيقي انسان) উড্ডীন করতে পারে। সেখানকার অদ্ভুত ও বিস্ময়কর দৃশ্যাবলী অবলোকন করতে পারে। যেটার বিবরণ দেয়া সম্ভব নয়। এ পদমর্যাদা সত্যিকার তাওহীদ-বাদীগণের, যারা স্বীয় অস্তিত্বকে আল্লাহর তা'আলার সত্তায় বিলীন করে দিয়েছে। তাদের অস্তিত্ব আল্লাহর অনুপম রূপ অবলোকনের সময় অস্তিত্বহীন হয়ে যায়। যেভাবে মানুষ যখন সূর্য রশ্মির সমুখস্থ হয় তখন তা তার চোখের

জ্যোতি ও দৃষ্টিকে ঘোলাটে করে দেয়। ফলে নিকটস্থ প্রাসাদসমূহও দেখতে না।

এভাবে মানুষ যখন আল্লাহর সৌন্দর্য দর্শন করে তখন সম্মোহনী দৃশ্য অবলোকন ও বিস্ময়ের আধিক্যের কারণে মোহনী শক্তির জগতে তার আপন সত্তা পর্যন্ত দৃষ্ট হয় না। হযরত সায়্যিদুনা ঈসা আলাইহিস সালাম বলেন–

لَنْ يَلِجَ الْاِنْسَانُ اِلَى مَلَكُوْتِ السَّموتِ حَتّي يُوْلَدَ مَرَّتَيْنِ كَمَا يُوْلَدُ الطَّيْرُ مَرَّتَيْنِ،

–যতক্ষণ মানুষ পাখিদের ন্যায় দ্বিতীয় বার জন্মগ্রহণ করে না ততক্ষণ আকাশসমূহের উর্ধ্বালোকে পরিভ্রমণ করতে পারে না।

এর মর্মার্থ হল, মানবীয় যোগ্যতার হাকীকত থেকে তিফলুল মা'আনীর আধ্যাত্মিক জন্ম হওয়া, আর এটাই মানবের গুপ্তভেদ। যেটার জন্মের ধারা ও অস্তিত্বের বহিঃপ্রকাশ শরীয়ত ও হাকীকতের জ্ঞানের সম্মিলনে প্রকাশ পায়। কেননা, নারী ও পুরুষের বীর্য যতক্ষণ সংমিশ্রণ না হয় সন্তান জন্ম লাভ হতে পারে না। (তবে আল্লাহ তা'আলা চাইলে ভিন্ন কথা)

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ ﴿٢﴾

–নিশ্চয় আমি মানবজাতিকে (পুরুষ ও নারীর) মিশ্রিত বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছি যেন আমি তাকে পরীক্ষা করি।[১]

মানবীয় এ গুঢ় তত্ত্ব প্রকাশের পর মানুষ সৃষ্টি রহস্যের সমুদ্রগুলো পাড়ি দিয়ে 'অমর' (امر) হয়ে যায় অর্থাৎ আধ্যাত্মিকতার (روحانية) স্তর লাভ করে। তখন সমগ্র জগত আধ্যাত্মিক জগতের সামনে একবিন্দু পানির মত দেখা যায়। এরপর আধ্যাত্মিক ও গুপ্ততত্ত্ব জ্ঞানের (علم لدنی) স্রোতধারা প্রবাহিত হয়ে যায়, যা শব্দ ও অক্ষর বিহীন আত্মপ্রকাশ করে।

[১]. আল কুরআন : সূরা দাহর, ৭৬/২

পঞ্চম অধ্যায়

তাওবা ও তালকীন

প্রকাশ থাকে যে, উল্লেখিত পদমর্যাদা কামিল পীরের দীক্ষা ব্যতীত অর্জন করা যায় না। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلتَّقْوَىٰ ﴿٢٦﴾

–আর তিনি (আল্লাহ) তাদেরকে তাক্‌ওয়ার বাক্যে সুদৃঢ় করলেন।[১]

তাদের জন্য তাক্‌ওয়া গ্রহণ করা অপরিহার্য। অর্থাৎ তাওহীদের বাণী– لا اله الاالله محمد رسول الله (সুদৃঢ়ভাবে গ্রহণ করা) তবে শর্ত হল যে, ঐ বাণী কোন তাক্‌ওয়াধারী অন্তর থেকে গ্রহণ করতে হবে, যেটা পার্থিব কামনা থেকে মুক্ত হবে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য মৌখিক কালেমা নয় যা প্রত্যেকে উচ্চারণ করে থাকে। বাহ্যতঃ শব্দমালা একই কিন্তু এর মূল অর্থে অনেক পার্থক্য রয়েছে। কারণ, তাওহীদের রত্ন (বীজ) কোন যোগ্য মুর্শিদের অন্তর থেকে গ্রহণ করতে হবে। আর তখনই তার অন্তর সজীব হয়ে উঠবে। তাওহীদের এ বাণী মারিফাতের বীজ বপনের জন্য অত্যন্ত উপকারী। যখন বীজ ভাল ও প্রভাবপূর্ণ হয় তখন উৎকৃষ্ট ফসল লাভ হয়। পক্ষান্তরে অপূর্ণ ও অপরিপক্ক বীজ অঙ্কুরিত হওয়ার ক্ষমতাই রাখে না। এ জন্য কুরআন মজীদে তাওহীদের বাণীর বর্ণনা দু'টি স্থানে করা হয়েছে। তন্মধ্যে একটির প্রয়োগ জাহেরের উপর হয়ে থাকে। যেমন–

إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٣٥﴾

–যখনই তাদের বলা হল যে, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বল, তখন তারা অহংকার করে।[২]

এটা সাধারণ লোকদের সাথে সম্পৃক্ত। আর দ্বিতীয় বাণীটি হাকীকতের জ্ঞানের সাথে সম্পৃক্ত। যেমন এরশাদ হয়েছে–

فَٱعْلَمْ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنۢبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ

---

[১]. আল কুরআন : সূরা ফাতাহ, ৪৮/২৬
[২]. আল কুরআন : সূরা সাফ্‌ফাত, ৩৭/৩৫

–সুতরাং জেনে নাও যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আর হে হাবীব! আপন খাস-লোকদের এবং মুসলমান পুরুষ ও মুসলমান নারীদের পাপরাশির মার্জনা প্রার্থনা করুন।[১]

এ আয়াতে কারীমায় বিশেষ বান্দাদেরকে যিক্‌রের শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

যিক্‌রের শিক্ষা

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র খিদমতে অতি নৈকট্য এবং সর্বোত্তম ও সহজ তরীকতের শিক্ষা লাভের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রত্যাদেশের (وحي) জন্য অপেক্ষার পর হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম হুযুরের খিদমতে উপস্থিত হয়ে তিন বার তাওহীদের বাণী শিক্ষা দিলেন এবং স্বয়ং হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম সেটা পড়তে লাগলেন। আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামও অনুরূপ আবৃত্তি করলেন।

অতঃপর হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে ঐ বাণী শিক্ষা দিলেন। এরপর সাহাবায়ে কিরামগণ রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হলেন তখন তিনি উপস্থিত সকলকে এটা শিখিয়ে দিলেন। অতঃপর এরশাদ করলেন–

رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الْأَصْغَرِ إِلَى الْجِهَادِ الْأَكْبَرِ ، جِهَادِ النَّفْسِ ،

–আমরা ছোট জিহাদ থেকে বড় জিহাদ (নফসের সাথে জিহাদ)'র দিকে প্রত্যাবর্তন করছি।[২]

এ ছাড়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক সাহাবীকে বললেন–

وَأَعْدى أَعْدَائِكَ نَفْسِكَ الَّتِي بَيْنَ جَنْبَيْكَ ،

–তোমার সবচেয়ে বড় শত্রু হল তোমার নফস (রিপু) যা তোমার দু'পার্শ্বদেশের মধ্যখানে রয়েছে।[১]

---

[১]. আল কুরআন : সূরা মুহাম্মদ, ৪৭/১৯
[২]

আল্লাহর ভালবাসা ততক্ষণ পর্যন্ত লাভ হতে পারে না যতক্ষণ না অন্তঃস্থ শত্রু নফসে-আম্মারা, নফসে-লাওয়ামা ও নফসে-মুলহিমার উপর বিজয় অর্জন করা যায়। আর যখন মানুষ চরিত্রের কুস্বভাবসমূহ যেমন– মাত্রাধিক পানাহার, নিদ্রা অনর্থক কাজে নিয়োজিত হওয়া ও শয়তানী গুণাবলী যেমন- অহংকার, ধোঁকা, খোদ পছন্দী, হিংসা-বিদ্বেষ, পরনিন্দা ইত্যাদি থেকে পবিত্র হয়ে যায় তখন সে স্বচ্ছ, পরিচ্ছন্ন ও তাওবাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

আল্লাহ তা'আলার বাণী–

إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

–নিশ্চয় আল্লাহ তাওবাকারীদেরকে ভালবাসেন এবং পরিচ্ছন্ন ব্যক্তিদেরকে পছন্দ করেন।[২]

যে শুধুমাত্র জাহেরী (প্রকাশ্য) পাপ ও অন্যায় থেকে তাওবা করে, আর বাতিনী (অভ্যন্তরীণ) দিক থেকে তাওবা করে না, সে প্রকৃতার্থে এ আয়াতের ভাষ্যের উদ্দেশ্য হতে পারে না। যদিও সে তাওবাকারী (تائب) কিন্তু সে অধিক তাওবাকারী (تواب)'র পর্যাভুক্ত হবে না। 'তাওয়াব' (تواب) শব্দটি মুবালাগা বা আধিক্য জ্ঞাপক শব্দ। তা দ্বারা বিশেষ লোকদের তাওবা উদ্দেশ্য। তথাপি ঐ ব্যক্তিও তার লক্ষ্য অর্জন করে যে প্রকাশ্য পাপ থেকে তাওবা করে নেয়। এর দৃষ্টান্ত হল ঐ ব্যক্তির কৃষি ক্ষেত্রের ন্যায় যে তার ক্ষেত থেকে আগাছা ইত্যাদি উপরিভাগ থেকে কেটে নেয় কিন্তু আগাছার মূলোৎপাটন করে না, যার ফলে তা পূর্বের চেয়েও শাখা-প্রশাখায় আরো অধিক পল্লবিত হয়ে যায়।

আর 'তাওয়াব' হল ঐ ব্যক্তি যে অকপট চিত্তে তাওবা করে। অর্থাৎ যেন সে ঐ ক্ষেত থেকে যাবতীয় আগাছা সমূলে উৎপাটন করে ফেলে দেয়। অতঃপর তা কখনো পুনর্বার গজাতে পারে না। তখন তার এ তাওবা এমন একটি হাতিয়ার মতো হয়ে যায় যেটা খোদাভীরুদের (متقين) হৃদয়পট থেকে আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত সবকিছুকে পরিস্কার করে দেয়।

[১]. সিহাব উদ্দীন মুহাম্মদ আলুসী : তাফসীরে আলুসী, ৩/২০৯
[২]. আল কুরআন : সূরা বাকারা, ২/২২২

আর যে ক্ষেতের আগাছা নির্মূল করে বৃক্ষ রোপন করবে না সে ঐক্ষেত থেকে সুমিষ্ট ফল ও শস্য কিভাবে উৎপাদন করবে? হে জ্ঞানীগণ! এটা থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর। যেন তোমরা কৃতকার্য হতে পার এবং অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পার। আল্লাহ তা'আলার বাণী–

وَهُوَ ٱلَّذِى يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِۦ وَيَعْفُوا۟ عَنِ ٱلسَّيِّـَٔاتِ ﴿٢٥﴾

–তিনিই সে সত্তা যিনি তাঁর বান্দাদের তাওবা কবুল করেন এবং পাপরাশি মার্জনা করে দেন।[১]

তিনি আরো এরশাদ করেন–

إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَٰلِحًا فَأُو۟لَٰٓئِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّـَٔاتِهِمْ حَسَنَٰتٍ ﴿٧٠﴾

–যারা তাওবা করেছে, ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে তারা ঐসব লোক যাদের পাপসমূহ আল্লাহ তা'আলা পুণ্যে পরিবর্তন করে দেন।[২]

তাওবার প্রকারভেদ

তাওবা দু'প্রকার। যথা- ১. তাওবায়ে আম (توبه عام) বা সাধারণ তাওবা।
২. তাওবায়ে খাস (توبه خاص) বা বিশেষ তাওবা।

সাধারণ তাওবা ঃ সাধারণ তাওবা হল যে, মানুষ পাপ থেকে তাওবা করে পুণ্যের প্রতি ধাবিত হওয়া, কু-স্বভাব বর্জন করে উত্তম স্বভাব গ্রহণ করা, দোযখ থেকে মুখ ফিরিয়ে জান্নাতের প্রতি অগ্রসর হওয়া এবং শারীরিক প্রশান্তি বর্জন করে নফস বা কু-রিপুর সাথে জিহাদ করা।

বিশেষ তাওবা ঃ যখন এ সাধারণ তাওবা হাসিল হবে, তারপর পুণ্যাত্মাদের পুণ্যরাশির মাধ্যমে খোদাতত্ত্ব জ্ঞান তথা আরিফের মর্যাদায়, তা থেকে নৈকট্যের পদমর্যাদার দিকে এবং কায়িক শান্তি থেকে আত্মিক প্রশান্তির দিকে অগ্রসর হওয়াই হল তাওবায়ে খাস। অর্থাৎ তখন খোদা তা'আলার মহান সত্তা ব্যতীত অন্য কিছুর ধারণাও অন্তরে আনবে না। এভাবে খোদাপ্রীতিকে অগ্রে

[১]. আল কুরআন : সূরা শূরা, ৪২/২৫
[২]. আল কুরআন : আল ফুরকান, ২৫/৭০

রাখবে ও তাঁর মহান সত্তাকে দৃঢ়বিশ্বাসের সাথে দেখবে। আর উপর্যুক্ত বিষয়াবলী হল কায়িক উপার্জন। আর এখানে তো কায়িক উপার্জনও পাপ। যেমন হুযুর নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করা হয়েছে যে– 'তাঁর দেহ মোবারক এমন এক বিশেষ পর্দার অভ্যান্তরে রয়েছে সেটার সাথে কোন পর্দার তুলনা চলে না।' যেভাবে ইসলামের পুরোধাগণ (اكابر) নৈকট্যধন্যদের ব্যাপারে বলেছেন–

حَسَنَاتُ الْاَبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُقَرَّبِيْنَ ،

–মহৎ ব্যক্তিদের পুণ্যও নৈকট্যধন্যদের পদমর্যাদা অনুযায়ী পাপ।[1]

এ জন্য নবী ও রাসূলকুল সরদার হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমি আল্লাহর দরবারে দৈনিক একশ বার ইস্তিগফার করি।' আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন–

وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ ﴿١٩﴾

হে হাবীব! আপনি বিশেষ ইস্তিগফার করুন।[2]

অর্থাৎ আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনে সচেষ্ট হোন। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, সকল বস্তুর মোহ ত্যাগ করে আল্লাহ অভিমুখী হওয়া ও তা দ্বারা উদ্দেশ্য পরকালে নৈকট্যের পদমর্যাদা অর্থাৎ নিরাপদ আলয়ে (জান্নাতে) প্রবেশ করা। নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন–

اِنَّ لِلّٰهِ عِبَادًا اَبْدَانُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَقُلُوْبُهُمْ تَحْتَ الْعَرْشِ ،

–নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলার এমন কতিপয় বিশেষ বান্দা রয়েছে যাদের কায়া পৃথিবীতে থাকে কিন্তু তাদের অন্তকরণ আরশে মোয়াল্লার ছায়ায় থাকে।

---

[1]. শামসুদ্দীন কুরতুবী : তাফসীরে কুরতুবী, ১/৩০৯; বদরুদ্দীন : উমদাতুল কারী, ১১/২৭৭

[2]. আল কুরআন : সূরা মুহাম্মদ, ৪৭/১৯। এ আয়াত প্রসঙ্গে পূর্বসুরী আলেমগণ অনেক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, মর্মার্থ ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন এবং যুগে যুগে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অসংখ্য আলেম স্ব-স্ব অভিব্যক্তি পুস্তকাকারে প্রকাশ করেছেন। আর অনেক আলেম তো এ মাসয়ালার সমাধান করতে গিয়ে মন্দ মনোভাবের জটিলতায় পড়ে বেআদব ও শানে রিসালতের প্রতি অবমাননাকারী হিসেবে সাব্যস্ত হয়েছে। কিন্তু مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی রোগ বাড়তেই থাকল যে ঔষুধই সেবন করলাম।' আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা যেন তিনি তাদেরকে হেদায়ত করেন। এ প্রসঙ্গে হযরত শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি 'মাদারেজুন নুবুওয়াত'-'র প্রথম খণ্ডে গবেষণাধর্মী বিশ্লেষণ করেছেন, রাসূল প্রেমিকদের সেদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা উচিত (উর্দু)– অনুবাদক।

কারণ, পার্থিবজগতে তো আল্লাহর শোভা ও সৌন্দর্য দর্শন সম্ভব নয়। তবে আল্লাহর গুণাবলীর জলওয়া হৃদয়দর্পনে দর্শন করা যেতে পারে।

যেমন, আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন–

رَاٰى قَلْبِيْ رَبِّيْ اَيْ بِنُوْرِ رَبِّيْ ،

–আমার অন্তকরণ আল্লাহর জ্যোতির মধ্যস্থতায় মহান রবকে দর্শন করেছে।

অতএব প্রমাণিত হল যে, হৃদয় দর্পনে আল্লাহর নূর প্রতিবিম্বিত হয়। কিন্তু এ দর্শন (مشاهدة) ওয়াসিল, মকবুল ও কামিল পীরের দীক্ষা ব্যতীত অর্জিত হয় না। তাঁরাই হচ্ছেন এ মুশাহিদের অগ্রণী মর্যাদার অধিকারী। অতঃপর আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে তাদেরকে পূর্ণতা দান করে থাকেন।

নবী ও ওলীর মধ্যে একটি পার্থক্য হচ্ছে, আউলিয়ায়ে কিরামদেরকে বিশেষ ব্যক্তিদের পথ নির্দেশনার জন্য প্রেরণ করা হয়। আর নবী সাধারণ ও বিশেষ (عام و خاص) সকলের হিদায়তের জন্য প্রেরিত হন আর নবী স্বাধীন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হন, তিনি কারো অধীন নন। কিন্তু ওলী ও মুরশিদ বিশেষ ব্যক্তিদেরকে পথনির্দেশ করেন, তাঁরা স্বাধীন নন। এজন্য ওলী আপন নবীর অধীন ও অনুসারী হন (অন্যথায় তিনি বিলায়ত লাভ করতে পারে না)। যদি কোন ওলী শরীয়ত ও তরীকতের বিধানের ক্ষেত্রে স্বাধীন সত্তার দাবীদার হয় তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে। আর সায়্যিদে আলম নবী মুকাররাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বাণী–

عُلَمَاءُ اُمَّتِيْ كَاَنْبِيَاءِ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ ،

–আমার উম্মতের আলেমগণ বনী-ইস্রাঈলের নবীদের ন্যায়।[1]

এর মর্মার্থ হল, যেভাবে বনী-ইস্রাঈলের নবীগণ একের পর এক আগমন করে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের শরীয়তের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছিল, তাঁর শরীয়ত প্রচারে ব্যাপৃত ছিল, তাঁর শরীয়তের বিধান বাস্তবায়ন ও পুনরুজ্জীবিত

---

[1]. রাযী : তাফসীরে রাযী, ৮/৩০২; মোল্লা আলী কারী : মিরকাতুল মাফাতীহ, ৯/২১২

করতে ছিল তেমনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের আলেম অর্থাৎ আউলিয়ায়ে কেরামগণকে বিশেষ ব্যক্তিদেরকে হেদায়তের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। যেন তাঁরা শরীয়তে মুহাম্মদীর বিধান প্রচার ও প্রসারে ব্যাপৃত থাকেন, সেটা বাস্তবায়ন ও প্রতিষ্ঠায় অনন্তর প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন এবং শরীয়ত ও তরীকতপন্থীদের অন্তর, যেটা মারিফাতের মূলকেন্দ্রস্থল সেটাকে কু-ধারণার প্রবঞ্চনা থেকে স্বচ্ছ, পরিচ্ছন্ন ও নির্মল রাখেন। এ সত্যপন্থী আলেমগণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইলমের সংবাদ দিতে থাকেন। যেমন আসহাবে সুফ্‌ফাগণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের মি'রাজ শরীফের ঘটনা বর্ণনার পূর্বেই ওই বিষয়ে আলোচনা করতেন। অতএব সত্যিকার আলেমগণই নবুয়তী বিলায়তের ধারক, যা রূহানীভাবে তাঁর নবুয়তের মর্যাদারই বহিঃপ্রকাশ। আর আমানতের গুরুদায়িত্ব তাঁদের উপর ন্যাস্ত। ঐ আলেমদের মধ্যে প্রত্যেকেই ওইরূপ জ্ঞানী নন যারা প্রকাশ্য (জাহেরী) জ্ঞানার্জন করে। কিন্তু তাঁরাও আলিমের স্বীকৃতিনুযায়ী সম্মানিত নবীদের উত্তরাধিকারী হন। কারণ, তাঁদের এ সম্পর্ক যাভীল আরহামের ন্যায়। আর 'যাভীল আরহাম' (ذوي الارحام) হচ্ছে ওইসব ভাই-বোন যাদের মাতা একজন কিন্তু পিতা ভিন্ন ভিন্ন। এমন সন্তান পরিপূর্ণভাবে উত্তরাধিকারের হকদার সাব্যস্ত হয় না। তাই পূর্ণ উত্তরাধিকারী তো সে হতে পারে যে হাকীকী (সহোদর) সন্তান হয়। কারণ, এরূপ সন্তানের স্বীয় পিতার সাথে সম্পর্ক অন্যান্য আত্মীয়দের তুলনায় সুদৃঢ় হয়। তাই আপন সন্তান পিতার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সব ভেদ ও রহস্যের উত্তরাধিকারী হয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন–

إِنَّ مِنَ الْعِلْمِ كَهَيْئَةِ الْمَكْنُوْنِ لاَ يَعْلَمُهُ إِلاَّ الْعُلَمَاءُ بِاللهِ ،

–এমন কিছু গুপ্ত জ্ঞান রয়েছে যেগুলো আলেমে রাব্বানীগণ ব্যতীত কেউ জানেন না।[১]

যখন তারা ঐ জ্ঞান দ্বারা বাক্যালাপ করে তখন আহলে ইজ্জত (তরীকতপন্থী)গণ সেটা অস্বীকার করে না। আর তা এমন রহস্য ও গুপ্তভেদ যা ত্রিশ হাজার রহস্যের পর্দার সবচেয়ে অন্তবর্তী পর্দার সুগভীর স্থানে লুকায়িত রয়েছে। যে বিশেষজ্ঞান মি'রাজ রজনীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা

[১]. রাযী : তাফসীরে রাযী, ১/২৬৯; আবু হামেদ গায্‌যালী : মিশকাতুল আনওয়ার, ১/১

আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র অন্তকরণে গচ্ছিত রাখা হয়েছে, তা নৈকট্যধন্য সাহাবায়ে কেরাম ও আহলে সুফ্‌ফাগণ ব্যতীত অন্য কাউকে দান করা হয়নি। আর ঐগুপ্ত জ্ঞানের বরকতে শরীয়তে মুহাম্মদী মহাপ্রলয় অবধি প্রতিষ্ঠিত থাকবে। ঐ জ্ঞান সমুদ্রে পৌছার জন্য আধ্যাত্মিক (রূহানী) পথ অতিক্রম করতে হয়। অবশিষ্ট সকল জ্ঞান ও মা'রিফাত তো সেটার তুলনায় আলোকচ্ছটা ও খোসার ন্যায়। অধিকিন্তু যাহেরী আলেমগণও কোন কোন পর্যায়ে নবীগণের উত্তরাধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়। তাদের মধ্যে কতিপয় আলেম শরীয়তের ফরয ও বিধি-বিধানের জ্ঞানী, আর অনেকে যাভিল আরহামের ন্যায় নয়। এরা ওইসব আলেম যাদেরকে জাহেরী জ্ঞান দান করা হয়েছে, যেন তারা শরীয়তের এসব বিধি-বিধান মানুষের নিকট সঠিকভাবে বর্ণনা করতে পারে এবং তাদেরকে আল্লাহ অভিমূখী করতে ব্যাপৃত থাকে।

আর ঐ মহান শায়খগণ যাদের তরীকতের পরম্পরা জ্ঞান-শহরের দ্বার হযরত সায়্যিদুনা আলী মুরতাদ্বা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সাথে সম্পৃক্ত তাদের জন্য যেন জ্ঞান-শহরের দ্বারের (باب مدينة العلم) দরবারকে জ্ঞানের মূলকেন্দ্র বানিয়ে দেয়া হয়েছে। তারা উত্তম পন্থায় জনসাধারণকে সত্যের পথে আহ্বান করতে থাকে।

যেমন এরশাদ হয়েছে–

ٱدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ۖ وَجَـٰدِلْهُم بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ ۚ ﴿١٢٥﴾

–হে হাবীব! আপনি লোকদেরকে হিকমত ও সদুপদেশের মাধ্যমে আপনার রবের পথে আহ্বান করুন এবং তাদের সাথে উত্তম পন্থায় তর্ক করুন।[১]

অর্থাৎ দলীল-প্রমাণাদির মাধ্যমে আল্লাহর দিকে আহ্বান করুন। এক্ষেত্রে সত্যপন্থী ওলামা-মাশায়েখের মূল মিশন তো একটাই যে, তারা এ পন্থাত্রয়ের মাধ্যমে আল্লাহর পথে আহ্বান করবে এবং আল্লাহর সৃষ্টিকে সঠিক দিক নির্দেশনা দেবে। উপর্যুক্ত আয়াতে তিনটি মৌলিক বিষয় বর্ণনায় করা হয়েছে

[১]. আল কুরআন : সূরা নাহল, ১৬/১২৫

যে, হিকমত, সদুপদেশ ও (উত্তম পন্থায়) তর্ক। এ ত্রিবিধ গুণ হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। বিশুদ্ধ অভিমত হচ্ছে– রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত অন্য কেউ এসব গুণ ধারণে সক্ষমও হতে পারে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত ইলমকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথাক্রমে–

১. ইলমুল হাল, এটা এ ইলমত্রয়ের সারবস্তু বা ফসল। এটা আল্লাহর বিশেষ বান্দাদের দান করা হয়। যেটার উদ্যম ও সাহস তাদের সাহায্যকারী। যেমন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন–

هِمَّةُ الرِّجَالِ تَقْلَعُ الجِبَالَ ،

–আল্লাহর বান্দাদের সাহস ও উদ্দীপনা পর্বতসমূহকে সমূলে উৎপাটন করে দেয়।[১]

আর এখানে 'পর্বত' মানে হৃদয়ের কাঠিন্য, যা আউলিয়ায়ে কেরামদের দোয়া ও বিলাপের মাধ্যমে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন–

وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿٢٦٩﴾

–যাকে হেকমত দান করা হয়েছে তাকে অশেষ কল্যাণ দান করা হয়েছে।[২]

২. ঐ মগজ বা সারবস্তুর খোসা, যা জাহেরী আলেমদেরকে দান করা হয়েছে। যেটার লক্ষ্য আল্লাহর সৃষ্টিকে উত্তমপন্থায় উপদেশ দান করা, পুণ্যের প্রতি আহ্বান ও সকল প্রকার অসৎ ও মন্দকর্ম থেকে বিরত থাকার আদেশ দেয়া। এ প্রসঙ্গে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন–

اَلْعَالِمُ يَعِظُ بِالْعِلْمِ وَالْاَدَبِ وَالْجَاهِلُ يَعِظُ بِالضَّرْبِ وَالْغَضَبِ ،

–আলেম জ্ঞান ও শিষ্টাচার দ্বারা উপদেশ দেয়, পক্ষান্তরে মূর্খ উৎপীড়ন ও ক্রোধের মাধ্যমে উপদেশ দেয়ার চেষ্টা করে।

[১]. কাশফুল খুফা, ২/৩৩৩
[২]. আল কুরআন : সূরা বাকারা, ২/২৬৯

৩. ঐ খোসার ছাল, যা জাহেরী আলেমদের জন্য প্রদত্ত হয়েছে। এটা প্রকাশ্য বিচার ও শাসনব্যবস্থা বিষয়ক। যাদের দায়িত্ব হল যে, প্রজাদের মধ্যে প্রকাশ্যে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে বিচক্ষণতার সাথে রাষ্ট্র পরিচালনা করা। এ আয়াতে কারীমা–

وَجَٰدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴿١٢٥﴾

–এবং তাদের সাথে উত্তমপন্থায় তর্ক কর।[১]

অর্থাৎ মানুষের মধ্যে ন্যায় ও সাম্য প্রতিষ্ঠা করার প্রতি ইঙ্গিতবহ। এসব আলেম সাধারণত রাজ্যের শক্তি বৃদ্ধি ও বিজয় অর্জনে সচেষ্ট থাকে, যা ধর্মীয় বিধান সংরক্ষণ, সম্প্রসারণ ও বাস্তবায়নের কারণ হয়। খোসা বাদামের আবরণের ন্যায়, আলেমগণ পরিপক্ক বাদামের মধ্যস্থ খোসার ন্যায়, আর আউলিয়ায়ে কেরামগণ সেটার মগজতুল্য, যা উৎকৃষ্ট পরিপক্ক ফলের ন্যায় উপকারী। নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান–

عَلَيْكُمْ بِمَجَالِسِ الْعُلَمَاءِ وَاسْتِمَاعِ كَلَامِ الْحُكَمَاءِ فَاِنَّ اللهَ يُحْيِي الْقَلْبَ بِنُوْرِ الْحِكْمَةِ كَمَا يُحْيِي الْاَرْضَ الْمَيْتَةَ بِمَاءِ الْمَطَرِ ،

–তোমাদের জন্য আলেমদের সাহচর্য গ্রহণ এবং অভিজ্ঞদের নীতিবাক্য শ্রবণ করা অপরিহার্য। কারণ, আল্লাহ তা'আলা বৃষ্টির পানি দ্বারা যেভাবে মৃত ভূমিকে উর্বর ও সজীব করেন তেমনি জ্ঞানী ও বিজ্ঞদের হেকমতের জ্যোতি দ্বারা মৃত-অন্তরসমূহকে জীবন দান করেন।[২]

নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন–

اَلْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ ،

–হিকমত মুমিনের হারানো সম্পদ।[৩]

অর্থাৎ ঈমানদার ব্যক্তি কষ্ট-ক্লেশ সহ্য করে হেকমত অর্জনে ব্রতী হয়। যেখানেই হেকমত পায় সংরক্ষণ করে। আর যে বাণী সর্বসাধারণের মধ্যে

[১]. আল কুরআন : সূরা নাহল, ১৬/১২৫
[২]
[৩]. ইবনে কাসীর : তাফসীর-ই ইবনে কাসীর, ৬/৩৫; কানযুল উম্মাল,

বিদিত তা লওহে-মাহফুজ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে, যা পদমর্যাদা লাভের মাধ্যম ও সান্নিধ্য প্রাপ্তদের ওজীফা। এটা রুহুল কুদ্‌স বা জিবরাঈল আলাইহিস সালামের মাধ্যমে আলমে-জাবারুতে লওহে-আকবর থেকে অবতীর্ণ হয়েছে, যা আলমে-কুরবে অবস্থিত। তাই প্রতিটি বস্তু আপন মূলের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। যেভাবে দীক্ষিতদের (صاحبان تلقين) জন্য আত্মার অনন্ত জীবন অনুসন্ধান করা ফরয। সাইয়্যিদে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন–

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

–জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলমান নবর-নারীর উপর ফরয।[১]

এর দ্বারা ইলমে মারিফাত ও আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের জ্ঞান উদ্দেশ্য। তবে ঐ জ্ঞান ব্যতীত যা (জাহেরী ক্ষেত্রে) ফরয আদায়ের জন্য অপরিহার্য। ফিকহী মাসায়েলের প্রয়োজনীয় সামান্য জ্ঞান ব্যতীত জাহেরী জ্ঞানের সব কিছু অর্জন জরুরী নয়। তাই বিশ্বপ্রতিপালকের সন্তুষ্টি এটাতে নিহিত যে, বান্দা নৈকট্যের পদমর্যাদার প্রতি অগ্রসর হবার চেষ্টা করে যাবে এবং এ ছাড়া অন্য কোন পদবী ও পদমর্যাদা লাভের চিন্তা করবে না। মহামহিম রবের বাণী–

قُل لَّآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِى ٱلْقُرْبَىٰ ۗ

–হে হাবীব! আপনি বলে দিন, আমি তোমাদের নিকট (হেদায়ত ও সৎপথ প্রদর্শনের) কোন বিনিময় প্রত্যাশা করছি না, তবে নৈকট্যধন্যদের ভালবাসা ও প্রীতি প্রত্যাশা করছি।[২]

কতিপয় তাফসীরবেত্তাদের মতে, এটা দ্বারা নৈকট্য ও সান্নিধ্য লাভের জ্ঞান (علم قربت) উদ্দেশ্য।

[১]. ইবনে মাযা : আস্ সুনান, ১/২৬০
[২]. আল কুরআন : আশ শূরা, ৪২/২৩

ষষ্ঠ অধ্যায়

সূফী সম্প্রদায়

সূফীদেরকে নিম্নোক্ত কারণে 'আহলে তাসাউফ' (সূফী সম্প্রদায়) নামে নামকরণ করা হয়েছে।

১. তাওহীদ ও মারিফাতের নূর দ্বারা অন্তকরণকে প্রবৃত্তির কামনা থেকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করা।
২. আসহাবে সুফ্‌ফার সাথে সাদৃশ্য পাওয়া। আহলে সুফ্‌ফা হলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঐসব সাহাবী যাঁরা আজীবন মসজিদে-নববীকে জ্ঞানার্জনের কেন্দ্রস্থল বানিয়ে রেখেছিল।
৩. 'সাওফ' (صوف) বা পশমের তৈরী পোশাক পরিধানের কারণে।
[বকরীর পশম দ্বারা তৈরীকৃত এ বস্ত্র না অত্যন্ত মোটা আর না কোমল ও মোলায়েম] অর্থাৎ অমসৃণ মোটা পোশাক।

যারা তাসাউফের স্তরসমূহ পরিভ্রমণ করে পূর্ণতাসম্পন্নদের (كاملين) অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তারা কোমল পশমের পোশাক পরিধান করে, অবশ্যই এগুলো তালিযুক্ত হয়ে থাকে। আর তাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থাও হাল অনুযায়ী হয়ে থাকে এবং তাদের পানাহারও তাদের অবস্থান ও পদমর্যাদা অনুযায়ী হয়ে থাকে। যাহিদগণ, তারা মোটা অমসৃণ পোশাক পরিধান করবে ও সাধারণ আহার্য গ্রহণ করবে। আর আরেফগণ উৎকৃষ্ট পোশাক পরিধান ও উন্নতমানের পানাহার গ্রহণ করবে। মানুষের আপন মর্যাদা ও সাধ্য-সামর্থ অনুযায়ী কালাতিপাত করাই হল সুন্নতে মুস্তাফা আলাইহিস সালাম। যেন কেউ আপন গণ্ডি ও পরিসীমা থেকে বেরিয়ে না যায়। আর তা এজন্য যে, আরিফগণ আল্লাহ তা'আলার দরবারে উচ্চ পদপমর্যাদায় অধিষ্ঠিত।

'তাসাউফ' (تَصَوُّف) শব্দের বর্ণতাত্ত্বিক রহস্য

تصوف শব্দে চারটি বর্ণ রয়েছে- ت (তা), ص (সোয়াদ), و (ওয়া) ও ف (ফা)। এখন এ শব্দ চতুষ্টয়ের বিশ্লেষণ দেখুন-

১. ت (তা) মানে তাওবা

এটা দু'প্রকার। যথা- ক. তাওবা-ই জাহির (প্রকাশ্য তাওবা) এবং খ. তাওবা-ই বাতিন (অভ্যন্তরীণ তাওবা)।

ক. জাহেরী তাওবা হল, মানুষ কথাবার্তা ও কাজ-কর্ম দ্বারা নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সর্বপ্রকার পাপ ও মন্দ-কর্ম থেকে নিরাপদ রাখা এবং শরয়ী বিধি-বিধানের উপর আমল করা। শরয়ী বিধানের বিরুদ্ধাচরণ না করা, এর প্রতিটি নির্দেশ পালন করা। আর যদি শরীয়তপরিপন্থী কোন কর্মকাণ্ড সংঘটিত হয়ে যায় তবে কালবিলম্ব না করে তাওবা করে নেয়া।

খ. বাতিনী তাওবা হল, মানুষ হৃদয়ের পঙ্কিলতা দূর করে যাবতীয় কদর্যতা থেকে অন্তরকে পরিচ্ছন্ন ও স্বচ্ছ করা এবং ইখলাসের সাথে শরীয়তের আজ্ঞা পালনে সদা প্রস্তুত থাকা। এমনকি এক পর্যায়ে পাপরাশি পুণ্যে পরিবর্তিত হয়ে যায়। আর তখন ت (তা) বর্ণের সমস্ত স্তর পরিপূর্ণ হবে। বলা চলে তখন তাওবা কবুলের সনদ প্রাপ্ত হবে।

২. ص (সোয়াদ) মানে صفا বা পবিত্রতা

এটাও দু'প্রকার- ক. কলবের পবিত্রতা এবং খ. লতীফায়ে সির'র পবিত্রতা।

ক. কলবের পবিত্রতা ঃ কলবের স্বচ্ছতা হল যে, সেটাকে মানবীয় দুর্বলতা, পঙ্কিলতা ও ক্লেদ থেকে পাক 'পবিত্র করা' যা সাধারণভাবে অন্তরে বিদ্যমান থাকে। যেমন পানাহার, শয়ন, বাক্যালাপ করা ও শ্রবণের ইচ্ছা, তাছাড়া পার্থিব উপকারের প্রতি আসক্তি অর্থাৎ বাণিজ্যের সমৃদ্ধ ও আর্থিক লেনদেন, বিলাসতা, প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণে অধিক সঙ্গম, পরিবার-পরিজনের প্রতি সীমাতিত ভালবাসা প্রকাশ করা ইত্যাদি। উল্লেখিত নিন্দনীয় স্বভাবগুলো থেকে অন্তরকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রাখার একটিইমাত্র পন্থা রয়েছে আর তা হল প্রথমে কামিল মুর্শিদের নির্দেশনানুযায়ী সরব যিক্‌র (ذكر بالجهر)কে অপরিহার্য ওযীফারূপে গ্রহণ করা। অর্থাৎ উচ্চস্বরে যিক্‌র-আযকার করতে থাকা। আর এটার মাধ্যমে লতীফায়ে সির'র গোপন যিক্‌র (ذكر خفي) জারী হয়ে যাবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন-

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ﴿٢﴾

-নিশ্চয় তারাই পরিপূর্ণ ঈমানদার যে, যখন আল্লাহর জিকির করা হয় তখন তাদের অন্তর ওয়াজদ (আধ্যাত্মিক অচৈতন্য অবস্থা)-এ এসে যায়।[১]

অর্থাৎ আল্লাহর ভয়ে কম্পিত হয়। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল যে, তাদের হৃদয় আল্লাহর মহত্ত্বের ভয় ও প্রতাপের কারণে কম্পমান হয়ে যায়। উল্লেখ্য যে, আল্লাহর মহত্ত্বের ভয় অন্তরে তখন সৃষ্টি হয় যখন অন্তর উদাসীনতা মুক্ত ও সজাগ থাকে এবং হৃদয়ের দর্পণ ইবাদত ও সাধনার শুভ্রতায় এভাবে চমকিত হতে থাকে যে, তাতে ভাল-মন্দের পার্থক্য অদৃশ্য শক্তি দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

اَلْعَالِمُ يُنَقِّشُ وَالْعَارِفُ يُصَقِّلُ،

-আলিম নকশাঙ্কিত করে আর আরিফ বার্নিশ করে।[২]

অর্থাৎ আলেমগণ ভাল-কর্মের গুণাগুণ ও মন্দ-কর্মের ক্ষয়ক্ষতির চিত্র দেখান আর আরিফগণ অন্তরের মরচে পরিস্কার করে দেন।

খ. মকামে সির'র পবিত্রতা ঃ এটা আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য সব কিছু থেকে বিমুখ ও তাঁর প্রেমে উন্মুখ হওয়া এবং তাঁর নামসমূহ সির'র গোপন জিহ্বার স্থায়ী ওযীফা বানানোর মাধ্যমে অর্জিত হয়। মানুষ যখন এ পদমর্যাদায় পরিপূর্ণভাবে অধিষ্ঠিত হয়ে যায় তখন ص (সোয়াদ) বর্ণের মনযিল পরিপূর্ণ হয়।

৩. و (ওয়া) মানে বিলায়ত

এটিও একটি পজিসন, যা আত্মার পরিশুদ্ধির পর লাভ হয়।

আল্লাহ তা'আলার বাণী-

أَلَآ إِنَّ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

-শুনে নাও! নিশ্চয় আল্লাহর ওলীগণ (ইহ ও পরজগতে) নির্ভয় ও সঙ্কাহীন।[১]

---

১. আল কুরআন ঃ সূরা আনফাল, ৮/২

২.

বিলায়তের প্রতিফল হল যে, মানুষের মধ্যে আল্লাহর চরিত্র ও গুণাবলী সৃষ্টি করা। যেমন, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লা এরশাদ করেছেন–

تَخَلَّقُوْا بِأَخْلَاقِ اللهِ تَعَالَى،

–তোমরা আল্লাহর চরিত্রে চরিত্রবান হয়ে যাও।[২]

অর্থাৎ মানবীয় পোশাক ছেড়ে আল্লাহর গুণাবলীর পোশাক পরিধান করা। হাদীসে কুদসীতে রয়েছে, আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন–

إِذَا أَحْبَبْتُ عَبْدًا كُنْتُ لَهُ سَمْعًا وَّبَصَرًا وَلِسَانًا وَّيَدًا وَّ رَجُلًا ، فَبِيْ يَسْمَعُ وَبِيْ يُبْصِرُ وَبِيْ يَنْطِقُ وَبِيْ يَبْطِشُ وَبِيْ يَمْشِيْ ،

–যখন আমি কোন বান্দাকে ভালবাসি তখন আমি তার কান, চক্ষু, রসনা হাত ও পা হয়ে যায়। অতঃপর সে আমারই প্রদত্ত ক্ষমতায় শ্রবণ করে, দেখে, বাক্যালাপ করে, পাকড়াও করে এবং চলাফেরা করে।[৩]

মানুষ যখন অন্যসব কিছু থেকে তার বাতেনকে পবিত্র করে নেবে তখন শুধু সত্য ও ন্যায়ই দৃষ্ট হবে, অসত্য বিলুপ্ত হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলার বাণী–

وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَـٰطِلُ ۚ إِنَّ ٱلْبَـٰطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴿٨١﴾

–হে হাবীব! আপনি বলে দিন, সত্য এসেছে, মিথ্যা বিলুপ্ত হয়ে গেছে, নিশ্চয় মিথ্যা তো বিলুপ্ত হবারই ছিল।[৪]

৪. ف (ফা) মানে 'ফানা' (فنا) অর্থাৎ আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলীতে বিলীন হওয়া

যখন মানবীয় গুণাবলী নিঃশেষ হয়ে যাবে তখন আল্লাহর গুণাবলী যেগুলো অবিনশ্বর সেগুলো দৃষ্ট হবে। এ জন্য যে, ঐ পবিত্র সত্তা চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী। ক্ষয় ও লয়ের সাথে ঐ যাতের কোন সম্বন্ধ নেই। তাই নশ্বর বান্দা ও তার

১. আল কুরআন : সূরা ইউনুস, ১০/৬২
২. রাযী : তাফসীরে রাযী, ৪/৭;
৩. হক্কী : তাফসীরে হক্কী, ৬/৪৮৮; তাবরিযী : মিশকাত, পৃ.
৪. আল কুরআন : সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭/৮১

ধ্বংসশীল কায়ার ঐ মহান সত্তার প্রেম ও প্রীতির দ্বারা 'বাকা বিল্লাহ' (باقي بالله) বা 'আল্লাহর সাথে অনন্ত জীবন'- এর পদমর্যাদা নসীব হয় এবং ধ্বংসশীল আত্মার স্থায়ী লতীফায়ে সির'এর সাথে স্থায়ীত্ব লাভ হয়। যেমন, মহান রবের বাণী–

كُلُّ شَىْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُۥ ۚ ﴿٨٨﴾

–প্রত্যেক বস্তু ধ্বংসশীল তবে তিনি ব্যতীত।[১]

অতএব ওই শাশ্বত সত্তার সন্তোষ এবং সন্তুষ্টির জন্য যখন বান্দা সৎকর্ম করার কষ্ট সহ্য করে তখন মহামহিম রবের সন্তুষ্টি পেয়ে যায়। তখন সে আল্লাহর দরবারে মকবুল ও প্রিয় হয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের সাথে সাথে অনন্তজীবন এর মর্যাদা (منزل) পেয়ে যায়। আর সৎকর্মের প্রতিফল হল যে, তা দ্বারা বান্দা বাতিনীভাবে ইনসানে, হাকীকী বা প্রকৃত মানুষ হয়ে যায়। যেমন এরশাদ হয়েছে–

إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ ﴿١٠﴾

–তাঁরই দিকে পবিত্র বাণীসমূহ সমুত্থিত হয়।[২]

অর্থাৎ সৎকর্ম তার পদমর্যাদা বৃদ্ধি করতে থাকে। প্রত্যেক ঐ আমল যাতে গাইরুল্লাহর প্রতি সম্বন্ধ থাকে তা ধ্বংসের কারণ হয়। যখন বান্দা পরিপূর্ণভাবে ফানা'র মনযিল পেয়ে যায় তখন সে নৈকট্যের-জগতে (عالم قربت) স্থায়ীজীবন (بقا) এর নেয়ামত প্রাপ্ত হয়। মহান রবের বাণী–

فِى مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍۭ ﴿٥٥﴾

–সত্যের মজলিসে মহা প্রতাপশালী বাদশাহ (আল্লাহর) এর নৈকট্যধন্য হয়ে থাকবে।[৩]

এটাই লাহুতের পদমর্যাদা, যা সম্মানিত নবী ও রাসূলদের জন্য নির্ধারিত। যেমন, মহান রবের বাণী–

১. আল কুরআন : সূরা ক্বাসাস, ২৮/৮৮
২. আল কুরআন : সূরা ফাতির, ৩৫/১০
৩. আল কুরআন : সূরা ক্বামার, ৫৪/৫৫

أَنَّ اللهَ مَعَ الصَّادِقِيْنَ ،

–আল্লাহ সত্যপন্থীদের সাথে রয়েছেন।[১]

নশ্বর যখন কদীমের সাথে মিলিত হয় তখন সেটার অস্তিত্ব লীন হয়ে যায়। যখন ফকীরী পরিপূর্ণ হয় তখন সূফীর বাকা বিল্লাহ'র পদমর্যাদা লাভ হয়। আল্লাহ তা'আলার বাণী–

أَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٨٢﴾

–জান্নাতবাসীগণ সেখানে চিরকাল থাকবে।[২]

আরো এরশাদ করেছেন–

إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿٤٦﴾

–নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথেই রয়েছেন।[৩]

১

২. আল কুরআন : সূরা বাকার, ২/৮২
৩. আল কুরআন : সূরা বাকারা, ২/১৫৩

সপ্তম অধ্যায়

যিক্‌র-আযকার

নিশ্চয় আল্লাহ যিক্‌রকারীদের পথনির্দেশক। তাঁর বাণী–

وَٱذْكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمْ ﴿١٩٨﴾

–তাঁর যিক্‌র কর যেভাবে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন।[১]

অর্থাৎ তাঁর মহত্ত্ব অনুযায়ী যিক্‌র করতে থাকো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন–

أَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ قَبْلِيْ لَا إِلٰهَ إِلا اللهُ ،

–আমার ও পূর্ববর্তী সমস্ত নবীদের বাণীতে সর্বোত্তম বাক্য হল– 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' (لااله الا الله محمد رسول الله)।[২]

প্রত্যেক মকামের জন্য একটি নির্দিষ্ট স্তর রয়েছে। যিক্‌র জাহেরী হোক কিংবা বাতিনী সর্বাগ্রে জাহরী বা ধ্বনি সমেত যিক্‌র করা উচিত। তারপর ক্রমান্বয়ে নফস, কলব, রূহ, সির, খফী ও আখফার যিক্‌রের নির্দেশ তার স্তর অনুযায়ী দেয়া হয়। যেমন–

জিহ্বার যিক্‌র ঃ জিহ্বার যিক্‌র হল, অন্তরকে রসনার মাধ্যমে আল্লাহর যিক্‌র দ্বারা সজীব করা যা সে ভুলে গিয়েছিল।

নফসের যিক্‌র ঃ এমন যিক্‌রকে বলে যা বর্ণ ও ধ্বনিহীন হয়। এটা অত্যাধিক গোপনীয়তার জগতে (অন্তরে) উপলব্ধি ও নড়াচড়ার মাধ্যমে শ্রবণ করা যায়।

কলবের যিক্‌র ঃ অন্তরের অন্তস্থল থেকে আল্লাহ তা'আলার মহত্ত্ব (جلال) ও সৌন্দর্য (جمال) দর্শন করা।

রূহের যিক্‌র ঃ আল্লাহ তা'আলার গুণাবলীর জ্যোতি ও তাজাল্লিসমূহ দর্শন করা।

১. আল কুরআন : সূরা বাকারা, ২/১৯৮
২. কুরতুবী : তাফসীরে কুরতুবী, ১/১৩২

সির লতীফার যিক্‌র ঃ আল্লাহ তা'আলার অতি গোপন ও নিগুঢ় রহস্যাদি উন্মোচনের জন্য মোরাকাবা (ধ্যান) করা।

যিকরে খফী ঃ ঐ মহা প্রতাপশালী সত্তার জ্যোতি ও তাজাল্লিসমূহ অন্তরের চক্ষু দ্বারা অবলোকন করা।

যিকরে আখফাল খফী ঃ আল্লাহর যাতের হাকীকত অন্তচক্ষু দ্বারা এভাবে করা যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারোর খবর থাকবে না। যেমন, আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন–

فَإِنَّهُۥ يَعۡلَمُ ٱلسِّرَّ وَأَخۡفَى ۝٧

–নিশ্চয় আল্লাহ গুপ্ত ও নিগুঢ় রহস্যাদি জানেন।[১]

যিকরে আখফাল খফী হল সমস্ত জ্ঞানের পরিসমাপ্তি ও সকল উদ্দেশ্যের পূর্ণতা।

জেনে রাখো যে, যদি তুমি রূহের জগতের স্তরসমূহ অতিক্রম করতে করতে চুড়ান্ত পর্যায়ে উন্নীত হও, যা সকল রূহ থেকে সূক্ষ্মতর, তাহলে সেটা হল 'তিফলুল মা'আনী'। যা অত্যাধিক রহস্যাবৃত ও বিভিন্নভাবে আল্লাহর পথে আহ্বানকারী। কতিপয় বুযুর্গ বলেন, এ প্রকারের রূহ বিশেষ-বান্দাদের জন্যই নির্ধারিত। যেমন আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন–

يُلۡقِي ٱلرُّوحَ مِنۡ أَمۡرِهِۦ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنۡ عِبَادِهِۦ ۝١٥

–তিনি আপন নির্দেশে স্বীয় বান্দাদের মধ্যে থেকেই যাকে ইচ্ছা ঐ বিশেষ রূহ দান করেন।[২]

এ রূহ সদাসর্বদা আল্লাহর কুদরত ও হাকীকতের জগত পর্যবেক্ষণ করতে থাকে এবং আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো প্রতি দৃষ্টিপাত করে না। যেমন নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন–

اَلدُّنْيَا حَرَامٌ عَلَى اَهْلِ الْاٰخِرَةِ وَالْاٰخِرَةُ حَرَامٌ عَلَى اَهْلِ الدُّنْيَا وَهُمَا حَرَامَانِ عَلَى اَهْلِ اللهِ تَعَالٰى،

[১]. আল কুরআন : সূরা তোয়াহা, ২০/৭
[২]. আল কুরআন : সূরা মু'মিন, ৪০/১৫

–পরকাল প্রত্যাশীর জন্য এ পৃথিবী হারাম এবং ইহজগত অনুসন্ধানীর জন্য পরজগত হারাম। আর আল্লাহওয়ালার জন্য ইহ ও পরজগত উভয়টিই হারাম।[১]

এটাই হল তিফলুল মাআনী অর্থাৎ প্রকৃত মানবের স্তর।

আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্যতা লাভের মাধ্যম হল যে, শরীয়তের বিধানের উপর অকপট হৃদয়ে নিষ্ঠার সাথে প্রতিষ্ঠিত থাকা, নিজকে দিন রাত পার্থিব লিপ্সা ও কামনা থেকে বিরত রাখার প্রচেষ্টা চালানো এবং সরবে ও নিরবে তাঁর যিক্‌রে ব্যাপৃত থাকা, এটা অত্যন্ত উপকারী। কারণ, সত্যান্বেষীর জন্য সর্বদা আল্লাহর স্মরণে নিমগ্ন থাকাই হল সবচেয়ে বড় উপকারী। মহান রবের বাণী–

فَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ قِيَٰمٗا وَقُعُودٗا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمۡۚ ۝١٠٣

–এবং আল্লাহকে স্মরণ কর দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে।[২]

যেমন এরশাদ হয়েছে–

ٱلَّذِينَ يَذۡكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَٰمٗا وَقُعُودٗا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمۡ ۝١٩١

–এবং তারা আল্লাহর যিক্‌র করে দাঁড়িয়ে, বসে ও করটের উপর শুয়ে।[৩]

তিনি আরো বলেন–

وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلۡقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ ۝١٩١

–এবং তারা আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টির মধ্যে গভীর চিন্তা-ভাবনা করতে থাকে।[৪]

[১]. হক্কী : তাফসীরে হক্কী, ৩/১৮৮
[২]. আল কুরআন : সূরা নিসা, ৪/১০৩
[৩]. আল কুরআন : সূরা আলে ইমরান, ৩/১০৩
[৪]. আল কুরআন : সূরা আলে ইমরান, ৩/১৯১

অষ্টম অধ্যায়

যিক্‌র-আযকারের শর্তাবলী

জাহেরী পবিত্রতা: যিক্‌রের সর্বপ্রথম শর্ত হল, (অযু কিংবা গোসলের মাধ্যমে) পরিপূর্ণভাবে পবিত্র হওয়া। অতঃপর উচ্চস্বরে পূর্ণশক্তি সহকারে যিক্‌র আরম্ভ করা, যেন যিক্‌রের ঐ জ্যোতিসমূহ বিকীর্ণ হয় যা যিক্‌রকারীদের অন্তরে সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং যেগুলোর মাধ্যমে তাদের আত্মা অনন্তজীবন ও পারলৌকিক অনুগ্রহরাজি লাভে ধন্য হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী–

لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَىٰ ﴿٥٦﴾

–তারা জান্নাতে প্রথম মৃত্যু ব্যতীত পুণরায় কোন মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে না।[১]

হুযুর নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন–

اَلْمُؤْمِنُوْنَ لَايَمُوْتُوْنَ بَلْ يَنْتَقِلُوْنَ مِنْ دَارِ الْفَنَاءِ اِلٰى دَارِ الْبَقَاءِ ،

–ঈমানদারগণ মৃত্যুবরণ করে না বরং তারা নশ্বর জগত থেকে স্থায়ী জগতে স্থানান্তরিত হয়।

রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো এরশাদ করেন–

اَلْاَنْبِيَاءُ وَالْاَوْلِيَاءُ يُصَلُّوْنَ فِيْ قُبُوْرِهِمْ ، كَمَا يُصَلُّوْنَ فِيْ بُيُوْتِهِمْ ،

–সম্মানিত নবী ও ওলীগণ স্ব-স্ব কবরে নামায আদায় করতে থাকেন। যেভাবে তারা আপন গৃহে নামায পড়তে থাকে।

অর্থাৎ তারা আপন রবের দরবারে দোয়া ও মুনাজাত করতে থাকে। এর অর্থ এ নয় যে, তারা কিয়াম, রুকু ও সিজদা সহকারে নামায আদায় করে বরং অর্থ হলো, তারা যিক্‌র-আযকার ও মুনাজাতে ব্যাপৃত থাকে। যেরূপ সাধারণ বান্দার অভ্যাস রয়েছে। এটা তাদের জন্য আল্লাহর মারিফত লাভের পুরস্কারস্বরূপ। অতঃপর যখন সজীব-অন্তর বিশিষ্ট আরেফ অধিকহারে মুনাজাত ও দোয়ায় নিমগ্ন থাকে তখন তারা আল্লাহর নিগুঢ় রহস্যাদি জ্ঞাত হওয়ার মাধ্যমে সম্মানিত (محرم) হয়ে যায়। তারপর তারা মৃত্যুবরণ করে না।

[১]. আল কুরআন : সূরা দুখান, ৪৪/৫৬

হুযুর নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন–

تَنَامُ عَيْنِيْ وَلَا يَنَامُ قَلْبِيْ ،

–আমার চক্ষুযুগল নিদ্রামগ্ন হয় কিন্তু অন্তর সজাগ থাকে।[১]

এ ছাড়া তিনি আরো এরশাদ করেন–

مَنْ مَاتَ فِيْ طَلَبِ الْعِلْمِ بَعَثَ اللهُ فِيْ قَبْرِهٖ مَلَكَيْنِ ، يُعَلِّمَانِهٖ عِلْمَ الْمَعْرِفَةِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَقَامَ فِيْ قَبْرِهٖ عَالِمًا وَعَارِفًا ،

–যে ব্যক্তি ইলমে-মারিফাত অনুসন্ধান করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে আল্লাহ তা'আলা তার কবরে দু'জন ফেরেশতা নিযুক্ত করে দেন, যারা তাকে কিয়ামত দিবস অবধি ইলমে মারিফাত শিক্ষা দিতে থাকবে। আর সে আপন কবর থেকে আলেম ও আরেফ হয়ে বের হবে।

এখানে দু'জন ফেরেশতা দ্বারা হুযুর রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও ওলীর রূহানী শক্তি উদ্দেশ্য। কারণ, মারিফাতের জগতের সাথে ফেরেশতাদের কোন সম্বন্ধ নেই।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন–

كَمْ مِنْ رَجُلٍ مَاتَ جَاهِلًا وَ قَامَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَالِمًا وَ عَارِفًا ، وَكَمْ مِنْ رَجُلٍ مَاتَ عَالِمًا وَقَامَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جَاهِلًا وَمُفْلِسًا ،

–এমন কতিপয় লোক রয়েছে যারা মূর্খ হয়ে মৃত্যুবরণ করবে কিন্তু যখন তারা কিয়ামত দিবসে কবরসমূহ থেকে পুনরুত্থান করবে তখন আলেম ও আরেফ হবে। আর এমন কতিপয় ব্যক্তিবর্গ রয়েছে যারা আলেমরূপে মৃত্যুবরণ করবে কিন্তু কিয়ামত দিবসে তারা মূর্খ, পাপী ও নিঃস্ব হয়ে উঠবে।

যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী–

أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَٰتِكُمْ فِى حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْيَا وَٱسْتَمْتَعْتُم بِهَا فَٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ ﴿٢٠﴾

[১]. কুশাইরী : তাফসীরে কুশাইরী, ২/৩৩৯; আবূল ফযল : আল মুসনাদুল জামে, ৪৪/৫০০

–তোমরা আপন অংশের পবিত্র বস্তুসমূহ পার্থিবজীবনেই বিনষ্ট করে ফেলেছ এবং সেগুলো দ্বারা উপকৃত হয়েছে। সুতরাং আজ তোমাদেরকে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।[১]

নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন–

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ

আমলের মূল ভিত্তি নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল।[২]

نِيَّةُ الْمَرْءِ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِهِ وَ نِيَّةُ الْفَاسِقِ شَرٌّ مِّنْ عَمَلِهِ لِأَنَّ النِّيَّةَ بِنَاءُ الْعَمَلِ ،

–মানুষের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম। আর পাপাচারীর মন্দ নিয়্যত তার পাপকর্মের চেয়েও নিকৃষ্ট। কারণ নিয়্যত হল আমলের ভিত্তি।[৩]

রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী–

وَبِنَاءُ الصَّحِيْحِ عَلَي الصَّحِيْحِ صَحِيْحٌ ، وَبِنَاءُ الْفَاسِدِ عَلَي الْفَاسِدِ فَاسِدٌ ،

–সৎকর্মের মূলভিত্তি সৎনিয়্যতের উপর আর অসৎকর্মের মূলভিত্তি মন্দনিয়্যতের উপর। অতএব আমলের মূলভিত্তি নিয়্যত যেরূপ হবে কর্মও তদনুরূপ হবে।

যেমন আল্লাহ্ তা'আলার বাণী–

مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْءَاخِرَةِ نَزِدْ لَهُۥ فِى حَرْثِهِۦ ۖ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِۦ مِنْهَا وَمَا لَهُۥ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ ﴿٢٠﴾

–যে ব্যক্তি আখিরাতের ফসল চায় আমি তার জন্য তার ফসল বৃদ্ধি করে দিই আর যে দুনিয়ার ফসল কামনা করে আমি তাকে তা থেকে

[১]. আল কুরআন : সূরা আহকাফ, ৪৪/২০
[২]. বোখারী : আস্ সহীহ, ২০/৩৮৭
[৩]. বায়হাকী : শুয়াবুল ঈমান, ১৪/৩৮৯; কাযী আবুল ফযল আয়ায : ইকমালূল মুয়াল্লিম, ৪/৬৮

কিছু প্রদান করব কিন্তু আখিরাতে তার কোন অংশ নেই (অর্থাৎ পরজগতে সে নিঃস্ব ও অংশহীন হবে)।[১]

অতএব, মানুষের জন্য অত্যাবশ্যক হল নশ্বরজীবনে মুর্শিদে-কামেলের নির্দেশনায় অনন্তজীবন লাভে চেষ্টা করতে থাকা। কারণ, اَلدُّنْيَا مَزْرَعَةُ الْآخِرَةِ 'দুনিয়া হল পরকালের শস্যক্ষেত্র।' যদি এ পৃথিবীর ক্ষেতে কোন বীজ বপনই করা না হয় তাহলে পরকালে কিসের ফসল তুলবে। এখানে ক্ষেত মানে আলমে-মূল্‌কে প্রবৃত্তিময় কায়ারূপী ভূমি।

[১]. আল কুরআন : সূরা শূরা, ৪২/২০

নবম অধ্যায়

আল্লাহ দর্শন

আল্লাহ তা'আলার দীদার বা দর্শনের দু'টি পদ্ধতি রয়েছে।

১. আখিরাতে কোন প্রকার মধ্যস্থতা ব্যতীত হৃদয়দর্পনে আল্লাহর জামাল (সৌন্দর্য) অবলোকন করা।
২. পৃথিবীতে কোন মধ্যস্থতা দ্বারা অন্তরদর্পনে আল্লাহর গুণাবলীর দর্শন লাভ করা।

দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলার সৌন্দর্যের প্রতিবিম্ব অন্তরদৃষ্টি দ্বারা দেখা যায়। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন–

مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَىٰٓ ﴿١١﴾

–যা তিনি দেখেছেন, তাঁর অন্তঃকরণ তা অস্বীকার করেনি।[1]

অর্থাৎ নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে পবিত্র অন্তঃকরণে আল্লাহর দর্শন লাভ করেছেন তা মিথ্যা নয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন–

اَلْمُؤْمِنُ مِرَاةُ الْمُؤْمِنُ ،

–মুমিন মুমিনের দর্পণস্বরূপ।

এখানে প্রথম মুমিন দ্বারা বান্দার অন্তর ও দ্বিতীয় 'মুমিন' দ্বারা আল্লাহর মহান সত্তাকে বুঝানো হয়েছে। অতএব যে ব্যক্তি এ পৃথিবীতে আল্লাহর সিফাতসমূহ দর্শন করেছে সে পরজগতে স্বয়ং আল্লাহর যাতকে আকারহীনভাবে দর্শন করবে। আউলিয়ায়ে কেরাম আল্লাহর সৌন্দর্যের গুণাবলী দর্শনের ব্যাপারে ওইরূপ বিভিন্ন দাবী করেছেন। যেমন, হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন–

رَاَيْ قَلْبِيْ رَبِّيْ بِنُوْرِ رَبِّيْ ،

–আমার অন্তর আমার রবকে তাঁর জ্যোতি দ্বারা দর্শন করেছে।

[1]. আল কুরআন : সূরা নাজম, ৫৩/১১

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর বাণী–

لَمْ اَعْبُدْ رَبًّا لَمْ اَرَاهُ ،

–আমি এমন রবের ইবাদত করি না যাকে আমি দেখিনা কিংবা আমি আমার রবের ইবাদত তাকে দেখে দেখে করি।

এসব দর্শন মূলত আল্লাহর গুণাবলী অবলোকন প্রসঙ্গে। যেমন কেউ আলোক রশ্মি কিংবা জানালা দিয়ে সূর্যের আলোকচ্ছটা দেখে বলে আমি সূর্য দেখেছি। আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদে তাঁর গুণাবলীকে নূর বা জ্যোতি দ্বারা পরিচয় দিয়েছেন। যেমন এরশাদ করেছেন–

ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ مَثَلُ نُورِهِۦ كَمِشْكَوٰةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ۖ ٱلْمِصْبَاحُ فِى زُجَاجَةٍ ۖ ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّىٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَٰرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ ﴿٣٥﴾

–আল্লাহ আসমানসমূহ ও যমীনের আলো। তাঁর আলোর উপমা এমনই যেমন একটা দীপাধার, যার মধ্যে রয়েছে প্রদীপ। ঐ প্রদীপ একটা ফানুসের মধ্যে স্থাপিত। ঐ ফানুস যেন একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র, তা প্রজ্জ্বলিত হয় বরকতময় বৃক্ষ যায়তূন দ্বারা।[1]

ওলামায়ে কেরাম বলেন, এ আয়াতে 'দীপাধার' (مشكوة) মানে ঈমানদারের কলব (অন্তঃকরণ), 'প্রদীপ' (مصباح) মানে রহস্যধারী অন্তর যাকে রূহে-সুলতানী বলা হয় ও 'ফানুস' (زجاجة) মানে জ্যোতির্ময় বাতিনী অন্তর। যেটাকে অতি উজ্জ্বল্যের কারণে আলোক ও চমকদার মুক্ত দ্বারা উপমা দেয়া হয়েছে। তারপর জ্যোতির বর্ণনা দেয়া হয়েছে। আর সেটাকে জ্যোতির উৎস ও কেন্দ্র বলা হয়েছে।

মা'দান (معدن) বা খনি এমন স্থানকে বলা হয় যেখান থেকে স্বর্ণ, রৌপ্য ও অন্যান্য খনিজ পদার্থ উদগত হয়। আর এ জ্যোতি যায়তূন বৃক্ষ দ্বারা প্রজ্জ্বলিত হয়। যা দ্বারা তালকীন (দীক্ষা) বৃক্ষ ও অকৃত্রিম তাওহীদ উদ্দেশ্য। যেটার

[1]. আল কুরআন : সূরা নূর, ২৪/৩৫

উৎসস্থল অংশীদারীত্বহীন গাইরে-কুদসী সিফাতের রসনা। যেমন নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন মজীদ স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার নিকট শিক্ষা লাভ করেছেন। কিন্তু এরপরও হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালামের অবতরণ তো হেকমত ও মুসলেহাতের নিরিখে ছিল, যেন কাফির মুশরিক ও মুনাফিকদের উপর দলীল ও প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়। এ দাবী প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলার এ বাণী ইঙ্গিতবহ–

وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى ٱلْقُرْءَانَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴿٦﴾

–নিশ্চয় আপনি প্রজ্ঞাময় ও সর্বজ্ঞাতার পক্ষ থেকে কুরআনের জ্ঞান প্রাপ্ত।[১]

এ কারণে হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম আগমণের পূর্বেও হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন সময় সাহাবায়ে কেরামদেরকে আয়াতে কারীমা শিক্ষা দিতেন। এমন কি আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করলেন, 'হে হাবীব! আপনি কুরআন পাঠে তাড়াতাড়ি করবেন না যতক্ষণ না ওহী আগমন করে।' ঠিক একই কারণই নিহিত ছিল যে, মি'রাজ রজনীতে হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম পেছনে রইলেন আর তিনি সিদরাতুল মুনতাহারও ঊর্ধ্বালোকে পরিভ্রমণ করে আসলেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে ঐ বরকতময় (যায়তূন) বৃক্ষের বর্ণনা দিয়েছেন–

لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ ﴿٣٥﴾

–সেটা না প্রাচ্যের না পশ্চাত্যের।[২]

আর সেটার পরীসীমা ও অস্তিত্বের সাথে না কোনরূপ উদয় ও অস্তের সম্বন্ধ রয়েছে বরং তা অনাদি, অনন্ত ও অবিনশ্বর। যেভাবে আল্লাহ তা'আলা অনাদি স্থায়ী। তাঁর সত্তা আদি ও অন্ত এবং ধ্বংস হওয়া থেকে যেমন পবিত্র তেমনি তাঁর সিফাত বা গুণাবলীও অবিনশ্বর। কারণ, তাঁর জ্যোতি (نور) ও যাবতীয় গুণ তাঁর সত্তার সাথে অস্তিত্বময়। অতএব যতক্ষণ হৃদয়দর্পন থেকে আবরণ উন্মোচিত ও অপসারিত না হবে ততক্ষণ তাঁর এ জ্যোতির বিকাশ ও তত্ত্বজ্ঞান (معرفة) লাভ করা অসম্ভব। আবরণসমূহ উন্মোচিত হওয়া ও আল্লাহর নূরে অন্ত

[১]. আল কুরআন : সূরা নমল, ২৭/৬
[২]. আল কুরআন : সূরা নূর, ২৪/৩৫

করণ আলোকিত হওয়া আল্লাহ তা'আলার গুণাবলীর সৌন্দর্য দর্শনের মাধ্যম। আর তখন এ গুঢ় রহস্যও উন্মোচিত হয়ে যায় যে, বিশ্বজগত সৃষ্টিতে এ হিকমতই নিহীত আছে যে, তা দ্বারা তাঁর গুপ্ত ভাণ্ডার প্রকাশ ও পর্যবেক্ষণ করানো। হাদীসে কুদসীতে রয়েছে–

كُنْتُ كَنْزاً مَخْفِياً فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لِيَعْرِفُوْنِيْ ،

–আমি এক গুপ্ত রহস্যের আধার ছিলাম। অতঃপর ইচ্ছা করলাম যেন আমি পরিচিত হই তখন আমি জগৎ সৃষ্টি করলাম যেন তারা আমার পরিচয় লাভ করে।[১]

[উল্লেখ্য আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম স্বীয় মাহবুব আহমদ মুজতবা মুহাম্মদ মুস্ত ফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সৃষ্টি করেছেন। যেভাবে অবিচ্ছেদ্য সূত্রে বর্ণিত বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।] মহান আল্লাহর দীদার তো ইনশাআল্লাহ আখিরাতে কপালের চক্ষু দ্বারা হবে। যেটাকে তিফলুল মা'আনী বলা হয়। মহান রবের বাণী–

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ﴿٢٢﴾ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿٢٣﴾

–কিছু মুখ সেদিন সজীব হবে, যারা আপন রবের দর্শন লাভ করবে।[২]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন–

رَأَيْتُ رَبِّيْ عَلَى صُوْرَةِ شَابٍّ أَمْرَدٍ ،

আমি আমার রবকে শ্মশ্রুহীন যুবকের আকৃতিতে দেখেছি।

অর্থাৎ মহান রবের নূর ও তাজাল্লী হৃদয় দর্পনে অবলোকন করেছি। কারণ, ঐ আকৃতি হল রূহানীদর্পণ, যা জ্যোতি ও জ্যোতি-অবলোকনকারীর মধ্যে একটি মাধ্যম মাত্র। যখন আল্লাহ তা'আলা আকৃতি-প্রকৃতি, পানাহার ও অস্তিত্বের বৈশিষ্ট্যাবলী ও প্রভাব থেকে পূতঃপবিত্র। সুতরাং তাঁর আকৃতি একটি দর্পণ মাত্র। (আর এ 'দর্পণ' শব্দটিও শুধুমাত্র বুঝানোর জন্য অন্যথায় তিনি তা থেকেও অনেক অনেক উর্ধ্বে।) দর্পণ ও দর্শক উভয়টিই মহান আল্লাহর সত্তার সাথে সম্বন্ধহীন। সুতরাং এ বিষয়টি উত্তমরূপে উপলব্ধি করা উচিত যে, যা দৃষ্ট হচ্ছে তা তো তার রহস্যের মগজ বা সারবস্তু। আর এ দর্শক আল্লাহর

[১]. নিশাপুরী, তাফসীরে নিশাপুরী, ১/২০৩; মোল্লা আলী কারী : মিরকাতুল মাফাতীহ, ১/৩৫৬
[২]. আল কুরআন : সূরা কিয়ামাহ, ৭৫/২২-২৩

সিফাতের জগতে। যেহেতু তিনি (আল্লাহ) নিজ কুদরতী সত্তার জগতে (عالم ذات), যেখানে মধ্যস্থতা, মাধ্যম ও উপকরণ জ্বলে ভস্মীভূত হয়ে যায়, সেখানে আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন সৃষ্টির নাম ও চিহ্নের অস্তিত্বও নেই। যেমন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন–

عَرَفْتُ رَبِّيْ بِرَبِّيْ ،

–আমি আমার রবকে তাঁর সত্তার মাধ্যমে চিনেছি।

অর্থাৎ তাঁর জ্যোতি লাভে সম্মানিত হয়েছি। মূলত প্রকৃত মানুষই ঐ পবিত্র নূর লাভের মাধ্যমে মর্যাদাবান হয়। হাদীসে কুদসীতে রয়েছে,

اَلْاِنْسَانُ سِرِّيْ وَاَنَا سِرُّهُ ،

–মানবজাতি আমার গুপ্তরহস্য এবং আমি তাদের গুপ্তভেদ।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী–

اَنَا مِنَ اللهِ وَالْمُؤْمِنُوْنَ مِنِّيْ ،

–আমি আল্লাহ থেকে আর মুমিনগণ আমার থেকে।

যেমন হাদীসে কুদসীতে রয়েছে–

خَلَقْتُ مُحَمَّدًا مِّنْ نُوْرِ وَجْهِيْ ،

–আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমার (কুদরতী) মুখমণ্ডলের বরকতময় নূর থেকে সৃষ্টি করেছি।

এখানে মুখমণ্ডল মানে আল্লাহ তা'আলার মহান সত্তা। যিনি রাহমানুর রাহীমের মহান গুণে গুণান্বিত। যেন সর্বক্ষমতার অধিকারী রব তাঁকে আপন যাতী নূর থেকে সৃষ্টি করেছেন। আপন 'রহমত'-এর গুণ দান করেছেন এবং 'রাহমাতুল্লীল আলামীন' অভিধায় ভূষিত ও বিশেষিত করেছেন। হাদীসে কুদসীতে মহান রবের বাণী–

اِنَّ رَحْمَتِيْ سَبَقَتْ عَلٰي غَضَبِيْ ،

নিশ্চয় আমার অনুগ্রহ আমার ক্রোধের উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছে।[১]

[১]. কুশায়রী : তাফসীর-ই কুশায়রী, ১/১০; হক্কী : তাফসীর-ই হক্কী, ৭/১৫৮; বোখারী : আস্ সহীহ, ২২/৪৩২; তাবরিযী : মিশকাত, باب صفة النا واهلها, ইবনে মাযাহ : আস্ সুনান, ১/২২১;

আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র নূরের মহত্ত্ব বর্ণনা করে এরশাদ করেছেন–

وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَٰلَمِينَ ﴿١٠٧﴾

–আমি আপনাকে সমগ্র বিশ্বজগতের রহমতরূপে প্রেরণ করেছি।[১]

আরো এরশাদ করেছেন–

قَدْ جَآءَكُم مِّنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَٰبٌ مُّبِينٌ ﴿١٥﴾

–নিশ্চয় তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে নূর ও স্পষ্ট কিতাব এসেছে।[২]

এখানে 'নূর' মানে হুযুর পাকের পবিত্র সত্তা আর 'স্পষ্ট কিতাব' মানে কুরআন মাজীদ। হাদীসে কুদসীতে রয়েছে–

لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْاَفْلَاكَ ،

–হে হাবীব! আপনাকে সৃষ্টি না করলে আমি এ বিশ্বজগত সৃষ্টি করতাম না।

[১]. আল কুরআন : সূরা আম্বিয়া, ২১/১০৭
[২]. আল কুরআন : সূরা মায়েদা, ৫/১৫

দশম অধ্যায়

অন্ধকার ও আলোকোজ্জ্বল পর্দাসমূহের বর্ণনা

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–

وَمَن كَانَ فِي هَٰذِهِۦٓ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي ٱلْءَاخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٧٢﴾

–যে পার্থিবজগতে অন্ধ সে পরকালেও অন্ধ এবং আরো বেশি পথভ্রষ্ট।[১]

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ঈমানের নূর দ্বারা আলোকিত হয়নি সে পরকালেও ওই গোমরাহীতে ফেঁসে থাকবে। এখানে অন্ধ হওয়া মানে অন্তঃকরণ অন্ধ হওয়া। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন–

فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَٰرُ وَلَٰكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ ﴿٤٦﴾

–তাদের চক্ষু অন্ধ হয় না বরং বক্ষস্থিত অন্তর অন্ধত্ব বরণ করে।[২]

ঐ অন্তর দৃষ্টিশক্তি থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ হল যে, তাতে উদাসীনতার আবরণ পড়ে আছে এবং আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার ভুলে গেছে। আর উদাসীনতার মূল কারণ হল আল্লাহর নির্দেশের পরিপন্থী অপবিত্রত দোষসমূহ বিদ্যমান থাকা। যেমন- অহংকার (تكبر), ধোঁকা (غرور), বিদ্বেষ (كينه), হিংসা (حسد), কৃপণতা (بخل), পরনিন্দা (غيبت), অন্যের ছিদ্রান্বেষণ করা (غيمة), মিথ্যা বলা (كذب) ইত্যাদি। আর উপরিউক্ত দোষাবলীর কারণে মানুষের 'আসফালা সাফিলীন' (অধঃপতন)-এর অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হয়।

১. আল কুরআন : সূরা বনী ইস্রাঈল, ১৭/৭২

২. আল কুরআন : সূরা হাজ্ব, ২২/৪৬;

ওই সব দুষ্টস্বভাব থেকে পরিত্রাণের একটিমাত্র পন্থা হলো, একত্ববাদের (توحيد) বিশ্বাসকে শান দেয়া। অর্থাৎ স্বচ্ছ ও তেজোদীপ্ত করা, যা ইলম, আমল ও জাহেরী-বাতিনী কঠোর সাধনা ব্যতিরেকে সম্ভব নয়। হৃদয়ের কালিমা ও মরিচা দূরীভূত হয়ে তাওহীদের জ্যোতি ও আল্লাহর গুণাবলী দ্বারা অন্তর সজীব হয়। অতঃপর সর্বদা আসল ঠিকানার কথা স্মরণ থাকবে এবং সেদিকে নিবিষ্ট হবে। আসল ঠিকানার প্রেম ও ভালবাসা অন্তরে সৃষ্টি করবে। অতঃপর আল্লাহর অশেষ কৃপা ও অনুগ্রহে লক্ষ্যস্থলে উপনীত হতে পারবে। অন্ধকারচ্ছন্ন পর্দা উন্মোচিত হওয়ার পর শুধু জ্যোতিই অবশিষ্ট থাকবে। তখন মানুষ আত্মিক (রূহানী) দৃষ্টির মাধ্যমে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করে। অতঃপর আল্লাহর গুণবাচক নামসমূহের জ্যোতি দ্বারা অন্তরাত্মা পরিশুদ্ধ হয়ে যায়। পর্যায়ক্রমে নূরের পর্দাসমূহও ধীরে ধীরে উন্মোচিত হতে থাকে। এমন কি তা এক সময় আল্লাহর নূরে জ্যোতির্ময় হয়ে যায়।

স্মর্তব্য যে, অন্তরের দু'টি চক্ষু রয়েছে, একটি বড়চক্ষু (عين كبري) ও অন্যটি ছোটচক্ষু (عين صغري)। ছোটচক্ষুর মাধ্যমে অন্তর আল্লাহর গুণবাচক নামসমূহের নূর দ্বারা সিফাতী জগতের সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত আল্লাহর মহান গুণাবলীর জ্যোতি ও তাজাল্লী অবলোকন করে। আর বড়চক্ষু আল্লাহর তাওহীদ ও একত্বের নূর দ্বারা আলমে-লাহুত ও আলমে-কুরবে আল্লাহর যাতী নূর দর্শন করে। মানুষের পক্ষে এ মহান পদমর্যাদা মৃত্যুর পূর্বে কু-প্রবৃত্তিসমূহ বিনাশের মাধ্যমেও অর্জিত হতে পারে। আর ঐ জগতে মানুষের পরিভ্রমণ কু-প্রবৃত্তি বর্জনের উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ মানুষ যে পরিমাণ কু-প্রবৃত্তি ধ্বংস করবে তদানুযায়ী কামনা ও কুরিপু বিনষ্ট হবে। অতঃপর আল্লাহ্ পর্যন্ত পরিগমণ করবে। আর তা এরূপ নয় যে, যেরূপ সম্পর্ক জ্ঞানের অস্তিত্বের সাথে জ্ঞানীর, বিবেকের সাথে বিবেকবানের, ধারণার সাথে ধারণাকারীর থাকে বরং এর ভাষ্য হল যে, মানুষ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য সব কিছুর (غير الله) সাথে যে পরিমাণ সম্পর্কচ্ছেদ করবে তদানুযায়ী তার নৈকট্য ও মিলনের সৌভাগ্য নসীব হবে। এ নৈকট্য প্রতিবেশীর সম্পর্কের ন্যায় কাছে ও দূরে, পার্শ্বে, সংযুক্ত ও পৃথক ইত্যাদি থেকে পবিত্র। বহু গুণে গুণান্বিত ঐ পবিত্র সত্তা যিনি অদৃশ্যজগতে থাকা সত্ত্বেও তাঁর জ্যোতির কারণে প্রকাশিত, যাঁর মারিফাতের অস্তিত্বও গোপন। (অর্থাৎ দুনিয়াবী মারিফাত তাঁর সত্তাগত পরিচয় অনুসন্ধানে

প্রতিবন্ধক। সুতরাং তার মহিমাময় সত্তার পরিচয়ের জন্য দুনিয়াবী মারিফাতের পর্দাসমূহ থকে বহির্গমন অপরিহার্য।) যে ব্যক্তি আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে দুনিয়াতে এ সূক্ষ্মতত্ত্ব (حقيقت) পেয়ে যাবে পরজগতে তার নিকট প্রশ্ন করা হবে না বরং সে বিনা হিসেবে ক্ষমা প্রাপ্ত হবে। অন্যথায় তার ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় হবে। অর্থাৎ সে প্রবৃত্তির ধোকার স্বীকার হয়ে বিভিন্ন বিপদ ও বিপর্যয়ে ফেঁসে যাবে। যেগুলোর সম্বন্ধ পরজগতের সাথে রয়েছে। অর্থাৎ কবরের শাস্তি, হাশরের হিসাব, আমলের পরিমাপ, পুলসিরাত অতিক্রম ও জাহান্নামের বিভীষিকা ইত্যাদির সম্মুখীন হবে।

একাদশ অধ্যায়

সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য

১. সৌভাগ্য (سعادت), ২. দুর্ভাগ্য (شقاوت) এ গুণদ্বয়ের কোন একটি থেকে কেউ মুক্ত নয়। অনেক সময় এ দু'টি বিষয় একই ব্যক্তির মধ্যে পাওয়া যায়। যখন কোন মানুষের এখলাস (নিষ্ঠা) ও পুণ্য অধিক হয় এবং তার কুপ্রবৃত্তির তাড়না রূহানিয়্যাতের সুপ্রবৃত্তির পোশাক পরিধান করে তখন তার সৌভাগ্য দুর্ভাগ্যের উপর আধিক্য বিস্তার করে। আর যখন মানুষ লোভ ও কুপ্রবৃত্তির তাড়নার শিকার হয় তখন দুর্ভাগ্য সৌভাগ্যের স্থান দখল করে নেয়। অধিকন্তু যখন উভয়টির মধ্যে সমতা সৃষ্টি হয় তখন সৌভাগ্যের পাল্লাই ভারী হয়। মহান আল্লাহর বাণী–

مَن جَآءَ بِٱلۡحَسَنَةِ فَلَهُۥ عَشۡرُ أَمۡثَالِهَا ۝١٦٠

–যে একটি পুণ্য নিয়ে এসেছে তার জন্য অনুরূপ দশটি পুণ্য রয়েছে।[১]
এ হল পার্থিব লেনদেন। যখন পরকালে আমল পরিমাপের সময় হবে তখন যে ব্যক্তি প্রবৃত্তির তাড়নাকে নিঃশেষ ও প্রতিহতকারী হবে তাকে বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশের নির্দেশ দেয়া হবে। তার আমলনামা পরিমাপের কোনরূপ প্রয়োজন পড়বে না। পক্ষান্তরে ঐ ব্যক্তি যার কর্মকাণ্ড এর বিপরীত হবে তাকে বিনা হিসাবে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তবে হ্যাঁ, যে ঈমানদারের পাপ পুণ্যের চেয়ে বেশি হবে সে পরিশেষে (শাস্তি প্রাপ্তির পর) জান্নাতে প্রবেশ করবে। এখানে সৌভাগ্য দ্বারা পুণ্য ও দুর্ভাগ্য দ্বারা পাপ উদ্দেশ্য। যখন তাতে পরিবর্তন সাধিত হবে তখন দুর্ভাগা সৌভাগ্যবান ও সৌভাগ্যবান দুর্ভাগা হয়ে যাবে। যদি পুণ্য বেশী হয় সৌভাগ্যবান আর (খোদা না করুক) যদি পাপ অধিক হয় তাহলে দুর্ভাগা হয়ে যাবে। দুর্ভাগ্যকে সৌভাগ্যে পরিবর্তনের জন্য তাওবা, মজবুত আকীদা পোষণ ও সৎকর্ম করা প্রয়োজন। কারণ, আল্লাহ তা'আলা ঈমান, তাওবা ও সৎকর্মের মাধ্যমে দুর্ভাগ্যকে সৌভাগ্যে পরিবর্তন করে দেন। অধিকিন্তু এটাও জেনে রাখা উচিত, সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য প্রত্যেকের ভাগ্যলিপিতে পূর্বেই লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, যা প্রত্যেকের জন্য কার্যকর হবে। যেমন নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন–

---

১. আল কুরআন : সূরা আন'আম, ৬/১৬০

اَلسَّعِيْدُ سَعِيْدٌ فِيْ بَطْنِ أُمِّهِ وَالشَّقِيُّ شَقِيٌّ فِيْ بَطْنِ أُمِّهِ ،

–সৌভাগ্যবান তার মাতৃগর্ভেই সৌভাগ্যবান হয়ে থাকে আর দুর্ভাগা তার মায়ের উদর থেকেই হতভাগা হয়।[১]

কিন্তু এ প্রসঙ্গটি আলোচনার বিষয়বস্তু বানানো যাবে না। কারণ, তাকদীরের ব্যাপারে আলোচনা ও তর্ক-বিতর্কের ফলাফল হল দুর্ভাগ্য ও কুফরীর কারণ। আবার এটাও কারো জন্য বৈধ নয় যে, তাকদীরকে বাহানা বানিয়ে কর্ম বিমুখ থাকা এবং এ বলে ঘুরে বেড়ানো যে, যখন আমি পূর্ব থেকেই দুর্ভাগা, আমাকে সৎকর্ম কি উপকার দেবে কিংবা যদি আমি পূর্ব থেকেই সৌভাগ্য ও পুণ্যবান হই আমার অসৎকর্ম আমার কী ক্ষতি করতে পারবে। অভিশপ্ত শয়তান যখন তার নির্দেশ অমান্যের বিষয়টি তাকদীরের সাথে সম্পৃক্ত করল তখন আল্লাহর দরবার থেকে বিতাড়িত হল। সে কুফরী ও অস্বীকৃতির কারণে চিরস্থায়ী অভিসম্পাতের উপযুক্ত হল। পক্ষান্তরে এর বিপরীতে যখন হযরত আদম আলাইহিস সালাম স্বীয় স্খলনকে নিজের প্রতি সম্পৃক্ত করল তখন সফলতা লাভ করল এবং বিশেষ অনুগ্রহ ও অনুকম্পার অধিকারী হল। সুতরাং প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আবশ্যক হল ভাগ্যলিপির ব্যাপারে চিন্তা-গবেষণা না করা। খোদা না করুক যেন অবস্থা ও বিশ্বাস পরিবর্তিত হয়ে না যায়। [তাকদীরে-ইলাহী দ্বারা যদি আল্লাহরজ্ঞান উদ্দেশ্য হয় তাহলে বিষয়টি কিছুটা সহজ হয়ে যায়। অর্থাৎ মানুষ যা কিছু আমল করে সেটার ভালমন্দ ফলাফল প্রকাশ পায় । আদি থেকে আল্লাহ তা'আলার এর জ্ঞান রয়েছে। কিন্তু মানুষ আমলের পর বুঝতে পারে যে, সে সৎকর্ম করেছে, না অসৎ! তবে এটি মনে করো যে, আল্লাহ তা'আলার ঐসব আমল ডুপ্লিকেট বা পরিবর্তন করার কোন প্রয়োজন নেই। যখন কর্ম সম্পাদিত হবে তখন জ্ঞাত হবেন এরূপ কখনো নয়। তিনি তো কুরআন মজীদের অসংখ্য স্থানে ঘোষণা করেছেন যে–

إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

–নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রত্যেক কর্মের জ্ঞান রয়েছে।[২]

---

[১]. হক্কী : তাফসীর-ই হক্কী, ১/১৯০

[২]. আল কুরআন : সূরা মায়েদা, ৫/৮

عَٰلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ ۖ ﴿٢٢﴾

–তিনি তো অদৃশ্য ও দৃশ্যমান বস্তু সম্পর্কে পরিজ্ঞাত।[১]

অর্থাৎ যা কিছু তোমাদের নিকট প্রকাশ্য সেগুলোর ব্যাপারে অবহিত আর যা কিছু তোমাদের নিকট অপ্রকাশ্য তাও তিনি জ্ঞাত। তাঁর সম্মুখে কোন কিছু অদৃশ্য নেই।]

এবং এ বিষয়টিকে ভয় কর যেন ভ্রষ্টতার গহ্বরে নিমজ্জিত না হও। ঈমানদারের জন্য এটা মেনে নেয়া জরুরী যে, আল্লাহ তা'আলা যাবতীয় জ্ঞান ও হেকমতের অধিকারী এবং মানুষের সকল কর্মকাণ্ড ও অবস্থা তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন। ঈমান, কুফর, পাপাচার ও নিফাক ইত্যাদি যেগুলো এ নশ্বর জগতে মানুষের সাথে সম্পৃক্ত এগুলো দ্বারা আল্লাহর অভিপ্রায় হল যে, তিনি স্বীয় ক্ষমতা ও হেকমত প্রকাশ করবেন। প্রকৃতপক্ষে এগুলোর মধ্যে অনেক সূক্ষ্ম রহস্য রয়েছে যেগুলোর ব্যাপারে বিশ্বজগতের শিক্ষক, খোদায়ী রহস্যের ধারক হুযুর মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত কেউ অবহিত নয়।

জনৈক আরিফের কাহিনী

বর্ণিত আছে যে, জনৈক আরেফ আল্লাহর দরবারে আবেদন করলেন, হে মহামহিম রব! তুমিই তাকদীর সৃষ্টি করেছ, তুমিই যা ইচ্ছা করছ, আর তুমিই আমার নফসের মধ্যে কামনা ও প্রবৃত্তি সৃষ্টি করেছ। উত্তর আসল, হে আমার বান্দা! এটা তো তাওহীদের সাথে সম্পৃক্ত বান্দার সাথে নয়। অর্থাৎ এরূপ কথাবার্তা তোমার শোভা পায় না। এতদশ্রবণে আরেফ পুনরায় আবেদন করলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমি ভুল করেছি, আমি পাপ করেছি, আমি নিজের উপর অত্যাচার করেছি। উত্তর আসল, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছি, আমি তোমাকে মার্জনা করে দিয়েছি এবং তোমার উপর অনুগ্রহ করেছি। তাই প্রত্যেক মুমিনের জন্য আবশ্যক হল, পুণ্যকে আল্লাহর প্রতি সম্পৃক্ত করা এবং পাপ ও মন্দকর্মকে নফসের পদস্খলন মনে করা। এভাবে সে বিশেষ-বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। যাঁদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন–

---

[১]. আল কুরআন : সূরা হাশর, ৫৯/২২

وَمَن يَعْمَلْ سُوٓءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُۥ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١١٠﴾

–এবং যে লোক মন্দ-অশ্লীল কর্ম কিংবা নিজের উপর যুলুম করে পরে আল্লাহর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করলে সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু পাবে।[১]

বান্দার কল্যাণ ও উপকার এটাতে নিহিত যে, সে পাপকে নফসের পদচ্যুতি মনে করবে এবং কোনভাবে তা আল্লাহর প্রতি সম্পৃক্ত করবে না। যদিও আল্লাহ তা'আলা কর্মের প্রকৃত স্রষ্টা। যে শব্দমালা হাদীসে পাকে এসেছে–اَلشَّقِيُّ وَالسَّعِيْدُ فِيْ بَطْنِ أُمِّه সৌভাগ্যবান ও দুর্ভাগা মাতৃগর্ভেই হয়ে থাকে। এখানে উম্মু (أمّ) দ্বারা মৌলিক উপাদান চতুষ্ঠয় (عناصر اربعة) উদ্দেশ্য। অর্থাৎ আগুন, পানি, মাটি ও বাতাস, যেগুলো দ্বারা মানুষের কায়া সৃষ্টি করা হয়। পানি ও মাটি সৌভাগ্যের প্রকাশস্থল। কারণ, এগুলো অন্তরে ঈমান, ইলম ও বিনয়কে সঞ্জীবিত করে এবং সেগুলোর ক্রমোন্নতির মাধ্যম হয়। পক্ষান্তরে বাতাস ও আগুন এর বিপরীত, ধ্বংসের কারণ ও ভস্মকারী। ঐ মহান সত্তার পবিত্রতা যিনি পরস্পর শত্রুজাত বস্তুকে একত্রিত করেছেন। যেমন মেঘমালায় পানি, আগুন, আলো ও অন্ধকার কেন্দ্রীভূত করে রেখেছেন। মহামহিম রবের বাণী–

هُوَ ٱلَّذِى يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ ٱلسَّحَابَ ٱلثِّقَالَ ﴿١٢﴾

–তিনি ঐ মহান সত্তা যিনি তোমাদেরকে বিজলী দেখান যাতে ভয় ও আশা রয়েছে এবং (বৃষ্টি বর্ষণের জন্য পানিপূর্ণ) ঘন মেঘমালা উত্তোলন করেন।[২]

[১]. আল কুরআন : সূরা নিসা, ৪/১১০
[২]. আল কুরআন : সূরা রা'দ, ১৩/১২

আল্লাহর পরিচিতি কিভাবে?

হযরত ইয়াহয়া বিন মু'আয রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে কেউ জিজ্ঞেস করল যে, আপনি আল্লাহর পরিচয় কিভাবে লাভ করলেন? উত্তরে তিনি বলেন, বৈপরিত্যের সন্নিবেশ দ্বারা। কারণ, মানুষকে আল্লাহর মহত্ত্ব ও সৌন্দর্যের দর্পণ বানানো হয়েছে। তারা বিশ্বজগতের সৌন্দর্যের সমষ্টি ও শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হিসেবে পরিচিত। মানুষকে আল্লাহ তা'আলা আপন কুদরাতের উভয় হাত দ্বারা মহত্ত্ব ও সৌকর্যের গুণের মাধ্যমে সৃজন করেছেন। দর্পণে পবিত্রতা-অপবিত্রতা, ভাল ও মন্দ উভয়টি থাকা প্রয়োজন। এ জন্য মানুষ আল্লাহর গুণাবলীর শ্রেষ্ঠ প্রকাশস্থল। এর বিপরীতে অন্যান্য বস্তু, যেগুলো কুদরতের একটি হাত দ্বারা সৃষ্টি করেছেন এবং সেগুলোতে একটি মাত্র গুণাবলী সন্নিবেশিত করেছেন। যেমন, ফেরেশতা– যারা 'সুব্বুহুন কুদ্দুসুন'-এর প্রকাশস্থল, তেমনি আবার আল্লাহর 'কাহ্‌হার' এর বৈশিষ্ট্যে ইবলীস ও তার বশধরদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে, তারা আল্লাহর 'জাব্বার' নামের বিকাশস্থল। এ জন্য সে অবাধ্যতা ও বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত হয়ে হযরত আদম আলাইহিস সালামকে সিজদা করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে। অধিকিন্তু মানুষ যেহেতু সমগ্র সৃষ্টির উত্তম ও হীন গুণের সমষ্টি, তাই আল্লাহর নৈকট্যধন্য বান্দাদেরও পদস্খলন হয়েছে। অবশ্যই সম্মানিত নবী-রাসূলগণ যেহেতু নবুয়ত ও রিসালতের মহান মর্যাদায় অধিষ্ঠিত তাই তাঁদেরকে সর্বপ্রকার পাপ-পঙ্কিলতা থেকে পূতঃপবিত্র রাখা হয়েছে। কিন্তু সম্মানিত ওলীগণ এ পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত নয়। আর আউলিয়ায়ে কেরাম যখন বিলায়তের সুউচ্চ পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়ে যান তখন তারাও কবীরা গুণাহ থেকে নিরাপদ হয়ে যান।

সৌভাগ্যের নিদর্শন

হযরত শাকীক বলখী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, সৌভাগ্যের পাঁচটি নিদর্শন রয়েছে– ১. হৃদয়ের কোমলতা, ২. অধিক রোদন ৩. কামনাহীনতা ৪. স্বাদ পরিত্যাগ ৫. লজ্জাশীলতা। তিনি আরো বলেন, দুর্ভাগ্যেরও পাঁচটি নিদর্শন রয়েছে। যথা- ১. হৃদয়ের কঠোরতা (অন্তর রুষ্ট ও পাষাণ হওয়া) ২. চক্ষুর শুষ্কতা (ক্রন্দন না করা ও অশ্রু প্রবাহিত না হওয়া) ৩. পার্থিব আসক্তি (দুনিয়াবী বস্তুর লোভ) ৪. দীর্ঘ আকাঙ্খা ৫. লজ্জার স্বল্পতা।

হাদীস শরীফ দেখুন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন–

عَلَامَةُ السَّعِيْدِ اَرْبَعَةٌ اِذَا أُتُمِنَ عُدِلَ، وَاِذَا عَاهَدَ وُفِيَ ، وَاِذَا تَكَلَّمَ صَدَّقَ، وَاِذَا خَاصَمَ لَمْ يَشْتِمْ،

–সৌভাগ্যের চারটি নিদর্শন রয়েছে, (যে ব্যক্তির মধ্যে এগুলো পাওয়া যাবে সে ভাগ্যবান।) সেগুলো হল- ১. আমানত রাখা হলে তা ন্যায়ভাবে রক্ষা করবে ২. প্রতিশ্রুতি দিলে পূর্ণ করবে ৩. কথা বললে সত্য বলবে ৪. বিবাদের সময় অশ্লীল বাক্য প্রয়োগ করবে না।

তিনি আরো এরশাদ করেন–

عَلَامَةُ الشَّقِّيِ اَرْبَعَةٌ اِذَا اُتُمِنَ خَانَ وَاِذَا عَاهَدَ اَخْلَفَ وَاِذَا تَكَلَّمَ كَذَّبَ وَاِذَا خَاصَمَ شَتَمَ ،

–দুর্ভাগ্যেরও চারটি নিদর্শন রয়েছে। অর্থাৎ- ১. তার নিকট আমানত রাখা হলে খিয়ানত করে ২. যখন অঙ্গীকার করে ভঙ্গ করে ৩. যখন কথা বলে মিথ্যা বলে ৪. যখন ঝগড়া-বিবাদ করে অশ্লীল কথা বলে।

আর ইসলামী ভাইদের উদাসীনতাপূর্ণ কর্মকে ক্ষমা না করাও দুর্ভাগার লক্ষণ। অধিকিন্তু উদারতা ও ক্ষমা প্রদর্শন ইসলামের মহান আদর্শের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা কুরআন করীমে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করেছেন–

خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأْمُرْ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَٰهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

–হে প্রিয় হাবীব! ক্ষমাপরায়ণতা অবলম্বন করুন, সৎকর্মের নির্দেশ দিন, আর মূর্খদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন।[১]

এ আয়াতে কারীমায় শুধুমাত্র হুযুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামকেই মার্জনার নির্দেশ দেয়া হয়নি বরং তাঁর সকল উম্মতের জন্য এ নির্দেশ প্রযোজ্য। এ ঘোষণা সার্বজনীন। কারণ যখন বাদশাহর পক্ষ থেকে কোন শাসনকর্তার প্রতি কোন নির্দেশ আরোপিত হয় তখন তাতে তার অধীনস্থ সকল প্রজাও অন্তর্ভুক্ত হয়। যদিও নির্দেশ গভর্ণর কিংবা প্রাদেশিক শাসককেই

[১]. আল কুরআন : সূরা আ'রাফ, ৭/১৯৯

দেয়া হয়। হুযুর সায়্যিদুনা গাউসে আযম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, ফকীর (লেখক) خذ العفو'র যে ব্যাখ্যা করেছি তাতে خذ দ্বারা এ উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে যে, تخلق به دائما –নিজের মধ্যে স্থায়ীভাবে মার্জনার গুণ সৃষ্টি কর। লোকদের দোষ-ত্রুটির মার্জনার স্বভাব যার মধ্যে অর্জিত হল প্রকৃতপক্ষে তার মধ্যে আল্লাহর মহান গুণ 'ক্ষমা' (عفو)-এর চরিত্র শোভিত হল। আল্লাহ তা'আলার বাণী–

فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِ ﴿٤٠﴾

–আর যে ক্ষমা করেছে এবং কার্য সংশোধন করেছে তার বিনিময় আল্লাহরই নিকট রয়েছে।[১]

উল্লেখ্য যে, তারবীয়ত ও অনুশাসনের প্রভাবে দুর্ভাগ্য সৌভাগ্যে পরিবর্তিত হয়ে যায়। যেমন সরকারে দো'আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন–

كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَاَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ اَوْ يُنَصِّرَانِهِ اَوْ يُمَجِّسَانِهِ

–প্রত্যেক নবজাতক ইসলামী স্বভাব ও প্রকৃতির উপর জন্মলাভ করে কিন্তু তার পিতা-মাতা তাকে ইয়াহুদী, খ্রিষ্টান ও অগ্নিপূজকে পরিণত করে।[২]

এ পবিত্র হাদীস এ কথার দলীল যে, প্রত্যেক মানুষের মাঝে সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের যোগ্যতা বিদ্যমান থাকে। তাই কোন মানুষের ব্যাপারে এ বলা উচিত নয় যে, সে আদি থেকেই সৌভাগ্যবান কিংবা দুর্ভাগা। হ্যাঁ যখন কোন ব্যক্তির পুণ্যরাশি তার পাপের তুলনায় অধিক হয় তবে তাকে সৌভাগ্যবান বলা বৈধ। একই ভাবে যার পাপরাশি পুণ্যকে অতিক্রম করে তাকে দুর্ভাগা বলতে কোন অসুবিধা নেই। এছাড়া অন্য কোন অপ্রাসঙ্গিক কথাবার্তা বৈধ নয়। কারণ, তখন সে বিশ্বাস করে বসে যে, কোন সৎআমল তাওবা ও অনুশোচনা ব্যতীত জান্নাতে চলে যাবে কিংবা কোন পাপ ও অপরাধ ব্যতীত দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। [অর্থাৎ তার দৃষ্টিভঙ্গি এ ভ্রান্ত ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে যে, তাকদীরেই এমনটি ছিল, যখন আল্লাহর নির্ধারিত ভাগ্যই এরূপ তাহলে পাপ-

[১]. আল কুরআন : সূরা শূরা, ৪২/৪০

[২]. বোখারী : আস্ সহীহ, ৫/১৮২; মুসলিম : আস্ সহীহ, ১৩/১২৬

পুণ্য করে লাভ ও ক্ষতি কী? এ ধারণা ও বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভুল।] এরূপ আকীদা ও বিশ্বাস কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যার পরিপন্থী। কারণ, ঈমানদার সৎকর্মশীল লোকদের জন্য জান্নাতের অঙ্গীকার রয়েছে। পক্ষান্তরে কাফির, মুশরিক ও গুণাহগারদেকের জাহান্নামের শাস্তির সংবাদ প্রদান করা হয়েছে–

فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢١﴾

–তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ শুনিয়ে দিন।[১]

আল্লাহ তা'আলার বাণী–

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَنْ أَسَآءَ فَعَلَيْهَا ﴿٤٦﴾

–যে সৎকর্ম করেছে সে নিজের জন্যই করেছে আর যে অসৎ ও মন্দকর্ম করেছে তা তার ক্ষতির জন্যই করেছে।[২]

আরো এরশাদ করেছেন–

ٱلْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ ۚ لَا ظُلْمَ ٱلْيَوْمَ ﴿١٧﴾

–আজ প্রত্যেকের অর্জনের বিনিময় প্রদান করা হবে। কারো সাথে অবিচার করা হবে না।[৩]

আরো উল্লেখ রয়েছে–

وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٣٩﴾

–মানুষের জন্য আপন প্রচেষ্টারই বিনিময় রয়েছে।[৪]

আরো এরশাদ করেছেন–

وَمَا تُقَدِّمُوا۟ لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ ﴿٢٠﴾

–আর তোমাদের নিজের জন্য যে সৎ কর্মই আগে প্রেরণ করবে, আল্লাহর নিকট তার (উত্তম বিনিময়) পাবে।[৫]

---

[১]. আল কুরআন : আলে ইমরান, ৩/২১
[২]. আল কুরআন : সূরা জাসিয়া, ৪১/৪৬
[৩]. আল কুরআন : সূরা মু'মিন, ৪০/১৭
[৪]. আল কুরআন : সূরা নজম, ৫৩/৩৯
[৫]. আল কুরআন : সূরা মুয্যাম্মিল, ৭৩/২০

দ্বাদশ অধ্যায়

ফকীরী ও তাসাউফ

ফকীরগণ, যাঁদের সূফী নামে অভিহিত করা হয়, ওলামায়ে কেরাম তাঁদের নামের মর্মভেদ প্রসঙ্গে বিভিন্ন কারণ ব্যক্ত করেছেন। যেমন-

প্রথমত ঃ তাঁরা صوف বা পশমী বস্ত্র পরিধান করতেন।

দ্বিতীয়ত ঃ তাঁরা স্বীয় অন্তকরণকে পার্থিব কামনা ও মলিনতা থেকে বাঁচানোর ও পবিত্র রাখতে চেষ্টা করতেন।

তৃতীয়ত ঃ তাঁরা আপন অন্তরে আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কাউকে স্থান দেয়নি।

আর কেউ কেউ বর্ণনা করেন যে, হাশরের দিন সূফী ফকীরগণকে সান্নিধ্যের জগতে (عالم قرب) প্রথমসারি দান করা হবে।

আলম (জগত) চার প্রকার। যথা- ১. আলমে মুল্‌ক (পার্থিব জগত) ২. আলমে মালাকুত (ফেরেশতাদের জগত) ৩. আলমে জাবারুত (প্রতাপের জগত) ৪. আলমে লাহুত, যেটাকে আলমে হাকীকত নামেও নামকরণ করা হয়েছে।

এভাবে ইলমও চার প্রকার। যথা-

১. ইলম শরীয়ত। ২. ইলমে তরীকত।
৩. ইলমে মারিফাত। ৪. ইলমে হাকীকত।

একইভাবে রূহও চার প্রকার। যথা-

১. রূহে জিসমানী। ২. রূহে নূরানী।
৩. রূহে সুলতানী। ৪. রূহে কুদসী।

অনুরূপভাবে তাজাল্লীও চার প্রকার। যথা-

১. তাজাল্লীয়ে আছার। ২. তাজাল্লীয়ে আফআল।
৩. তাজাল্লীয়ে সিফাত। ৪. তাজাল্লীয়ে যাত।

এভাবে আকলও চার ভাগে বিভক্ত। যথা-

১. আক্‌লে মা'আশ। ২. আক্‌লে মা'আদ।
৩. আক্‌লে রূহানী। ৪. আক্‌লে কুল।

আর উল্লেখিত প্রত্যেকটি আলম, ইলম, রূহ, তাজাল্লী ও আকলের পর্যায় বিন্যাসের মধ্যে মানুষের এমন একটি দলও রয়েছে, যারা প্রথম ইলমের পরিসীমা অর্থাৎ ইলমে শরীয়ত, প্রথম রূহ অর্থাৎ রূহে জিসমানী, তাজাল্লীয়ে আছার ও প্রথম প্রকার আকল অর্থাৎ আকলে মা'আশ এর সাথে সম্পৃক্ত, তাদের চিন্তাধারা শুধু ইহজগত কেন্দ্রিক, তাদের এর পরবর্তী জগতের কোন চেতনাই নেই। তারপরও তাদের স্থান হল প্রথম জান্নাত অর্থাৎ জান্নাতুল মাওয়া।

দ্বিতীয় দল হচ্ছে যারা দ্বিতীয় ইলম (তরীকত), দ্বিতীয় রূহ (রূহে নূরানী), দ্বিতীয় তাজাল্লী (তাজাল্লীয়ে আফ'আল) ও দ্বিতীয় আকল (আকলে মা'আদ যেটার সম্বন্ধ পরজগতের সাথে) সম্পৃক্ত। তারা এর পরবর্তী পর্যায়ে চিন্তা করে না। আর জান্নাতে তাদের অবস্থান জান্নাতুল নায়ীমে, যেটা দ্বিতীয় জান্নাত।

অতঃপর লোকদের তৃতীয় দল যাদের যোগ্যতা ইলমে মারিফাত, রূহে সুলতানী তাজাল্লীয়ে সিফাত ও আকলে রূহানী পর্যন্ত সীমাবদ্ধ, তাদের তৃতীয় জান্নাত নসীব হবে, যেটাকে জান্নাতুল ফিরদাউস বলা হয়। এসব দল তাদের প্রাপ্ত ওইসব বস্তু ও যোগ্যতার হাকীকত সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে। পক্ষান্তরে আরেফ ও ফকীরগণ এসব জান্নাতের কামনা-বাসনা থেকে বিমুখ থাকে। তারা তো হাকীকতের পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত ও পরমসান্নিধ্যে মিলিত হয়ে গেছে। তারা আল্লাহর ভালবাসা ব্যতীত অন্য কারো প্রেমে বন্দী হয়নি। বরং তারা আল্লাহর এ নির্দেশ فَفِرُّوا إِلَى اللهِ 'আল্লাহর দিকে ধাবিত ও অগ্রসর হও'[১]- এর উপর আমল করেছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন–

اَلدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةُ حَرَامٌ عَلٰي اَهْلِ اللهِ ،

–ইহ ও পরজগত উভয়টিই আরিফদের জন্য 'হারাম।'[২]

এখানে 'হারাম' দ্বারা উদ্দেশ্য হল, ঐসব লোকেরা স্বয়ং নিজেরাই আল্লাহর প্রেমে অন্যের অংশীদারীত্বকে হারাম করে নেয়। ইহ ও পরজগত হারাম নয়। কারণ, মহান রব স্বয়ং উভয়টি অনুসন্ধানের জন্য প্রার্থনার পদ্ধতি শিক্ষা দিচ্ছেন–

[১]. আল কুরআন : সূরা জারিয়া, ৫১/৫০

[২]. নাসিরুদ্দীন আলবানী : সিলসিলাতুদ দয়ীফা, ১/১০৯

رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿٢٠١﴾

–হে রব! আমাদেরকে ইহ ও পরজগতের কল্যাণ দান কর এবং জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা কর।[১]

আরেফগণ বলেন, আমরাও নশ্বর, দুনিয়া এবং আখেরাতও নশ্বর, তাহলে নশ্বর থেকে নশ্বর কিভাবে অনুসন্ধান করা যায়। তাই এসব নশ্বর সৃষ্টির জন্য অত্যাবশ্যক হল স্রষ্টাকেই অনুসন্ধান করা। [উল্লেখ্য যে, حادث মানে নব সৃষ্টি, সৃষ্ট বস্তুকে مُحْدَثٌ আর সৃষ্টিকারীকে مُحْدِثٌ বলা হয়।]

হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

مُحِبِّيْ مُحِبُّ الْفُقَرَاءِ ،

–ফকীরদের ভালবাসা আমার ভালবাসার অন্তর্ভুক্ত।

অর্থাৎ ফকীরদেরকে মুহাব্বতকারী স্বয়ং আমাকে ভালবাসে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন– اَلْفَقْرُ فَخْرِيْ وَاَنَا اَفْتَخِرُ بِهٖ –ফকীরী আমার গৌরব, আমি সেটা দ্বারা গর্ব করি। এ ফকীরী দ্বারা সাধারণ ফকীরী উদ্দেশ্য নয় যেটা সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচলিত বরং এখানে প্রকৃত ফকীরী উদ্দেশ্য। যেটার মর্মার্থ হল, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো নিকট মুখাপেক্ষী না হওয়া, ঐ মহান সত্তার অনুসন্ধান ব্যতীত অন্যসব স্বাদ, কামনা ও আশা-আকাঙ্খা সর্বান্তকরণে বর্জন করা। যখন মানুষ এ পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়ে যায় তখন এ পজিসনটিকেই فَنَا فِيْ اللهِ (আল্লাহর মধ্যে বিলীন) বলা হয়। তখনই অংশীদারহীন একক সত্তা ব্যতীত অন্য কারো ধারণাও অবশিষ্ট থাকে না এবং অন্তরে আল্লাহর মহান সত্তা ছাড়া অন্য কারো স্থান থাকে না। যেমন হাদীসে কুদসীতে রয়েছে–

لَايَسَعُنِيْ اَرْضِيْ وَ لَاسَمَائِيْ بَلْ يَسَعُنِيْ قَلْبُ عَبْدِيْ الْمُؤْمِنِ ،

[১]. আল কুরআন : সূরা বাকারা, ২/২০১

–সমস্ত ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল আমাকে ধারণ করা সম্ভব নয়, বরং আমাকে আমার মু'মিন বান্দার অন্তর ধারণ করে থাকে। (যেভাবে তাঁর মর্যাদায় উপযুক্ত)।

এখানে মু'মিন মানে 'মু'মিনে কামিল' যার অন্তর মানবীয় দূর্বলতা, কামনা, স্বাদ ও প্রবৃত্তি থেকে পবিত্র এবং যার হৃদয়ে অন্যের জন্য কোন স্থান নেই। তখন তার এ স্বচ্ছ অন্তরপটে আল্লাহর সৌন্দর্যের প্রতিবিম্ব প্রকাশিত হয়। হযরত আবু ইয়াযীদ বোস্তামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন–

لَوْ اَنَّ الْعَرْشَ وَمَا حَوْلَهُ اُلْقِيَ فِيْ زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَايَا قَلْبِ الْعَارِفِ مَا اَحَسَّ بِهِ ،

–আরশ ও এর চতুপার্শ্বে যা কিছুই রয়েছে যদি তা আরিফের অন্তরের এক পার্শ্বে রাখা হয় তবে তার বিন্দুমাত্র অনুভূত হবে না।[১]

যে ব্যক্তি এমন আল্লাহপ্রেমিকদের ভালবাসবে সে হাশরে তাঁদের সাথে থাকবে। তাঁদেরকে ভালবাসার নিদর্শন হল যে, ব্যক্তির অন্তরে তাঁদের সাহচর্য ও মজলিসে বসার ইচ্ছা ও তাদের প্রভাবে আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের জয্বা ও আবেগ সৃষ্টি হওয়া। হাদীসে কুদসীতে রয়েছে–

اَلاَ طَالَ شَوْقُ الاَبْرَارِ اِلَي لِقَائِيْ وَاَنِّي لَاَشَدُّ شَوْقًا اِلَيْهِمْ ،

–পুণ্যবানগণ আমার সাক্ষাতের প্রবল আকাঙ্খায় উৎসুক, অধিকিন্তু আমি নিজেও তদপেক্ষা তাদের সাক্ষাতে অধিক আগ্রহী।

সূফীগণ যেসব পোশাক পরিধান করে তা তিন প্রকার। যেমন আমি তৃতীয় অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি। আর তাদের আমল (কার্যাবলী) এ পথে প্রথম আরম্ভকারীর ন্যায় সৎ ও অসৎকার্য সম্বলিত। কিন্তু মধ্যম স্তরে যে পা রাখে সাধারণত তার পুণ্যই প্রকাশ পেতে থাকে। অবশ্যই তাদের পুণ্যের পর্যায় ও রং ভিন্ন ভিন্ন হয়। যেমন শরীয়ত, তরীকত ও মারিফাতের জ্যোতির বর্ণ ভিন্ন হয়ে থাকে। এভাবে তাদের বাতিনী পোশাকের বর্ণও ভিন্ন ভিন্ন হয়। যেমন- সাদা, নীল, সবুজ ইত্যাদি। আর যে আরেফ কিংবা ফকীর ফকীরীর এ স্তরসমূহ অতিক্রম করে তার আমল সূর্যের জ্যোতির ন্যায় হয়ে যায়। অর্থাৎ সূর্যের আলো যেভাবে অন্য কোন আলোকে গ্রহণ করে না তেমনি এটাও যাবতীয় রং শূন্য হয়। এ প্রকারের ফকীরের পোশাক কালো হয়। যেহেতু কালো রং অন্য

[১]. আল কুরআন : সূরা নাবা, ৭৮/১০-১১

কোন বর্ণের রূপ পরিগ্রহ করে না। বলা চলে ফকীর সর্বপ্রকার রং থেকে পবিত্র থাকে। তার নিদর্শন হল যে, তার থেকে মারিফাতের জ্যোতির পর্দা উন্মোচিত হয়ে যায়। মারিফাতের জ্যোতির আচ্ছাদন ঐরূপই যেরূপ রাত সূর্যের আলোর উপর আচ্ছাদন হয়ে থাকে। মহান রবের বাণী–

وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِبَاسًا ۝ وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشًا ۝

–আর আমি রাতকে আচ্ছাদন ও দিনকে জীবিকা অর্জনের মাধ্যম বানিয়েছি।[১]

অর্থাৎ রাত প্রত্যেক বস্তুকে অন্ধকারের বস্ত্রাবৃত করে দেয়। এ আয়াতে নিরাপদবোধসম্পন্ন ও হাকীকতের জ্ঞানে জ্ঞানীদের জন্য অতি নিগুঢ় ইঙ্গিত রয়েছে যে, দুনিয়া আল্লাহপ্রেমিদের বন্দীশালা। এ জন্য তারা এ পৃথিবীর জগতে দারিদ্র্য, ব্যথা-বেদনা, প্রেম-সাধনা, কষ্ট-ক্লেশ, সংকীর্ণতা, অন্ধকার ও নিরানন্দের মধ্যে কালাতিপাত করে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন–

اَلدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ ،

–এ পৃথিবী মু'মিনের কারাগার।[২]

তাই এ অন্ধকারচ্ছন্ন পৃথিবীতে অন্ধকার (কালো) পোশাক পরিধান অধিক সঙ্গত। (যেভাবে বন্দীশালায় কয়েদীকে কারাগারের নির্ধারিত ইউনিফর্ম পরিধান করতে দেখা যায়)। হাদীস শরীফে রয়েছে–

اَلْبَلَاءُ مُوَكَّلٌ عَلَي الْاَنْبِيَاءِ وَالْاَوْلِيَاءِ فَالْاَمْثَلُ ثُمَّ الْاَمْثَلُ ،

–বিপদ ও দুর্দশা সম্মানিত নবী ও ওলীদের নিত্যসঙ্গী, অতঃপর তাঁদের অনুসারী ও তাঁদের সঙ্গীদের।[৩]

সম্মানিত নবীগণকে কঠিন পরীক্ষা ও বিপদ দ্বারা পরীক্ষা করা হয়েছে এবং আউলিয়ায়ে কেরামদেরকেও অসংখ্য পরীক্ষা ও কষ্টে জর্জরিত করা হয়ে থাকে। অতঃপর তাদের অনুসারী এবং সঙ্গীগণও আপন পদমর্যাদানুযায়ী পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে থাকেন।

[১]. আল কুরআন : সূরা নাবা, ৭৮/১০-১১
[২]. শামসুদ্দীন কুরতুবী : তাফসীর-ই কুরতুবী, ১৬/৮৮; মুসলিম : আস্ সহীহ, ১৪/২০৫
[৩]. উক্ত হাদীসটি এভাবেও বর্ণিত আছে যে, أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ, [বোখারী শরীফ, ১৭/৩৮১]

শোকের পোশাক

কালো পোশাক ও কালো বর্ণের পাগড়ী ইত্যাদি প্রথমত বিপদাপন্নের নিদর্শন এবং শোকাকুল ও বিপদগ্রস্থের পোশাক। (এ জন্য এটাকে শোকের পোশাক নাম দেয়া হয়েছে)। পদমর্যাদা অন্বেষীদের যোগ্যতা (অর্থাৎ মোকাশাফা, মুশাহাদা ও মু'আয়িনা) যাদের বিনষ্ট হয়ে যায়, যারা স্বীয় আত্মার মৃত্যুর কারণে চিরন্তন জীবন থেকে বঞ্চিত হয়, যাদের আল্লাহ-প্রেমের আবেগ, স্পৃহা ও রূহে কুদসীর কার্যকারিতা নিষ্প্রভ হয়ে যায় এবং নৈকট্য ও মিলনের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়, এসব বিষয় মহা বিপদ ও দুর্দশার সাথে সম্পৃক্ত। এসব ব্যক্তিবর্গের জন্য উল্লেখিত শোকাবহ পোশাক স্থায়ীভাবে পরিধান করা অত্যন্ত জরুরী। কারণ, তারা পরজগতের কল্যাণ, উপকার ও ক্ষমার দৌলত হাতছাড়া করে বসেছে।

এটা বুঝার জন্য এ দৃষ্টান্তই যথেষ্ট যে, যখন কোন রমণীর স্বামী মৃত্যুবরণ করে তখন তার জন্য আল্লাহর নির্দেশ পালনে চার মাস দশদিন শোকাতুর ও চিন্ত গ্রস্থ থাকতে হয়, তখন না স্বর্ণ, উত্তম পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করতে পারে আর না স্বামীর ঘর থেকে বাইরে পা রাখতে পারে। কারণ, সে পার্থিব সুখ ও ফায়েদা লাভ থেকে বঞ্চিত হয়ে গেছে, যা তার স্বামীর বর্তমানে ছিল।

এরই ভিত্তিতে যার পরজগতের কল্যাণ বিনষ্ট হয়ে যায়, তার জন্য সদা-সর্বদা শোকের পোশাক পরিধান করা অত্যাবশ্যক। কারণ, পরকালের মঙ্গল থেকে বঞ্চিত হয়ে যাওয়া প্রকৃতপক্ষে চিরস্থায়ী পরিতাপ ও অনুশোচনার কারণ হয়ে থাকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমান–

اَلْمُخْلِصُوْنَ عَلٰي خَطَرٍ عَظِيْمٍ ،

–সাধকগণ মহা বিপদসঙ্কুলাবস্থায় থাকে।

এটা ফকীরী ও ফানা হওয়ার সিফাত।

হাদীস শরীফে রয়েছে–

اَلْفَقْرُ سَوَادُ الْوَجْهِ فِيْ الدَّارَيْنِ ،

–ফকীরী হল উভয় জগতে চেহারা কৃষ্ণবর্ণ হওয়া।

এর মর্মার্থ হল যে, ফকীরী শুধুমাত্র মহান আল্লাহর নূর ব্যতীত অন্য কোন প্রকার রং ধারণ করে না। যেমন মুখমণ্ডলের উপর কালো তিল সৌন্দর্য ও

কমনীয়তা বৃদ্ধির কারণ হয়, প্রিয় ও লাবণ্যময় হয়। এছাড়া চেহারার শ্রী ও সৌন্দর্যকে আরো বৃদ্ধি দেয়।

যখন নৈকট্য-লাভকারীগণ আল্লাহর সৌন্দর্য দর্শনে ধন্য হয়ে যায় তখন তাদের দৃষ্টিতে গাইরুল্লাহর কোন সৌন্দর্য ও মর্যাদা থাকে না। তারা ঐ মহামহিম রব ব্যতীত অন কারো প্রতি প্রেমের দৃষ্টি নিক্ষেপই করে না। তারা তো উভয় জগতে শুধু আল্লাহরই প্রেমিক ও সন্ধানী হয়ে থাকে। তাদের হৃদয় গাইরুল্লাহর আকাঙ্খা ও কামনা থেকে পূতঃপবিত্র থাকে। কারণ, মহান স্রষ্টা মানুষকে সৃষ্টিই করেছেন এ উদ্দেশ্যে যে, যেন তারা তাদের সাথে সম্পৃক্ত (অন্তঃস্থ) নৈকট্য ও মারিফাতের স্তরসমূহ অতিক্রম করতে থাকে।

অতএব মানুষের জন্য আবশ্যক হল, উভয় জগতে আল্লাহর সত্তার অনুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকা। আর এ জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে, যেন জীবনকে অযথা ও মূর্খতায় বিনষ্ট কিংবা ধ্বংস করা না হয় এবং এ ইহধাম ত্যাগের পর লজ্জিত ও অনুতপ্ত হতে না হয়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

পবিত্রতার বর্ণনা

পবিত্রতা দু'প্রকার। যথা-

১. বাহ্যিক পবিত্রতা, যেটা অর্জনের জন্য শরীয়ত অনুযায়ী পানি আবশ্যক।

২. অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা, যেটার জন্য তাওবা, তালকীন ও আত্মার পরিশুদ্ধি অপরিহার্য। এ পবিত্রতা তরীকতপন্থীদের পথে চলার মাধ্যমে অর্জিত হয়।

বাহ্যিক পবিত্রতার ক্ষেত্রে কোন অপবিত্র বস্তু নিঃসারণ হওয়াতেই অযু কিংবা গোসল আবশ্যক হয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন–

مَنْ جَدَّدَ الْوُضُوْءَ جَدَّدَ اللهُ اِلَيْهِ اِيْمَانَهٗ ،

–যে ব্যক্তি নতুনভাবে অযু করেছে আল্লাহ তা'আলা তার ঈমানকে সজীবতা দান করবেন।[১]

আরো এরশাদ করেছেন–

اَلْوُضُوْءُ عَلَي الْوُضُوْءِ نُوْرٌ عَلٰي نُوْرٍ ،

–অযুর উপর অযু করা জ্যোতির উপর জ্যোতি।[২]

মন্দ-কর্ম, যেমন– অহংকার ধোঁকা, হিংসা, বিদ্বেষ পরনিন্দা, অপবাদ, মিথ্যা চোগলখোরী ইত্যাদির কারণে অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা বিনষ্ট হয়ে যায়। একইভাবে চক্ষু, কান, হাত, পা ইত্যাদির অপকর্ম দ্বারাও অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা নষ্ট হয়ে যায়। যেমন সরকারে দোআলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন–

اَلْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ ،

–চক্ষুদ্বয় ব্যভিচার করে।[৩]

১

২. রদ্দুল মুখতার, ১/৩৩৪

৩. আবু জাফর তাবারী : তাফসীর-ই তাবারী, ২২/৫৩৮; আহমদ : মসনদে আহমদ, ৮/২৫২

যখন চক্ষুযুগল ব্যভিচারের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে যায় তখন বাতিনী অযু ভেঙ্গে যায়। তাই বাতিনী অযু তাজা করার পদ্ধতি হল পাপাচার ও উপরিউক্ত মন্দ-স্বভাবগুলো থেকে বিশুদ্ধ অন্তরে তাওবা করা, আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা, কৃত গুণাহসমূহের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রত্যাবর্তন করা। যাবতীয় অশ্লীল কর্ম ও ভ্রান্ত-বিশ্বাসকে অন্ত রের বাইরে নিক্ষেপ করা। (তখনই বাতিনী অযু নবায়ন সম্ভব হবে)

আরিফের জন্য অপরিহার্য হল, উপর্যুক্ত মন্দ-স্বভাবগুলোর বিপদ ও বিপর্যয় থেকে সম্পূর্ণভাবে নিজের তাওবাকে হেফাযত করা, যেন তার জাহেরী ও বাতিনী নামায বিশুদ্ধ দুরস্ত ও পরিপূর্ণ হয়। যেমন মহান রবের বাণী–

هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ﴿٣٢﴾

–এটা হচ্ছে তাই, যেটার অঙ্গীকার তোমরা করেছিলে, প্রত্যেক প্রত্যাবর্তনকারী ও সেটাকে উত্তমরূপে হেফাযতকারীদের জন্য।[১]

প্রত্যহ দিবস ও রাতের জন্য জাহেরী অযুর সময় নির্ধারিত। পক্ষান্তরে বাতিনী পবিত্রতার জন্য বাতিনী অযু স্থায়ীভাবে ফরয। অর্থাৎ সার্বক্ষণিকভাবে অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত অটুট ও বিদ্যমান থাকা অত্যাবশ্যক। জীবন মানে ইহ ও পারলৌকিক জীবন। কারণ, বাতিনী জীবনের তো কোন পরিসমাপ্তিই নেই।

---

১. আল কুরআন : সূরা ক্বাফ, ৫০/৩২

চতুর্দশ অধ্যায়

শরীয়ত ও তরীকতের নামায

শরীয়তের নামায সম্পর্কে অবশ্যই তোমরা অবগত। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন–

حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ ﴿٢٣٨﴾

–নামাযসমূহের হিফাযত কর, বিশেষত মধ্যবর্তী নামাযের।[১]

শরীয়তের নামায হল প্রকাশ্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ (হাত পা ইত্যাদি)'র সঞ্চালন ও নড়াচড়ার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। যেমন– দাঁড়ানো, রুকু, সিজদা, বৈঠক, কুরআন তিলাওয়াতের ধ্বনি ও তাসবীহ ইত্যাদি আদায় করা, এ জন্য উপরিউক্ত আয়াত علي الصلوات এ বহুবচনের শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে।

তরীকতের নামায হল সার্বক্ষণিক অন্তরের নামায। উপরিউক্ত আয়াতে وسطي শব্দ দ্বারা কলব (অন্তকরণ) উদ্দেশ্য। কারণ, কলব শরীরের মধ্যবর্তী স্থানে বিদ্যমান। অর্থাৎ ডান ও বাম পার্শ্বের মধ্যবর্তী অংশ এবং উপরি ও নিম্নভাগের মধ্যখানে অর্থাৎ সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের অন্তবর্তী স্থানে এর অবস্থান। যেমন রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী–

إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ كُلَّهَا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ كَقَلْبٍ وَاحِدٍ يُصَرِّفُهُ حَيْثُ يَشَاءُ

–নিশ্চয় আদম সন্তানের অন্তর (কলব) আল্লাহ তা'আলার কুদরতী আঙ্গুলসমূহের দু'টি আঙ্গুলের মধ্যখানে রয়েছে। আর তিনি [আপন শান অনুযায়ী] সেটা যেভাবে ইচ্ছা পরিবর্তন করেন।[২]

দুই আঙ্গুল দ্বারা উদ্দেশ্য আল্লাহ তা'আলার ক্রোধ ও অনুগ্রহের গুণ। আয়াতে কারীমা ও হাদীস শরীফের মাধ্যমে প্রতীয়মান হল যে, অন্তরের নামাযই হল প্রকৃত নামায। যখন মানুষ ঐ নামায থেকে উদাসীন হয় তখন তার নামায ভেঙ্গে যায়। আর যখন কলবের নামায ছুটে যাবে তখন জাহেরী তথা

[১]. আল কুরআন : সূরা বাকারা, ২/২৩৮

[২]. মুসলিম : আস্‌ সহীহ, ১৩/১১৯; তাবরিযী : মিশকাত, পৃ. ২০

শরীয়তের নামাযও বাতিল হয়ে যাবে। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন–

لاَ صَلوٰةَ اِلاَّ بِحُضُوْرِ الْقَلْبِ ،

–একাগ্রচিত্ত (হুযুরী কলব) ব্যতীত নামাযই হয় না।

কারণ, নামাযে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করা হয়, তাকে আহ্বান করা হয়, বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করা হয়। আর প্রার্থনার মূলকেন্দ্রবিন্দু হল কল্‌ব (অন্তর)। সুতরাং যখন কল্‌বই উদাসীনতার শিকার হয়ে গেল, তখন তার বাতিনী নামায ভেঙ্গে গেল এবং একই সাথে তার জাহেরী নামাযও বিনষ্ট হয়ে গেল। কারণ, প্রার্থনা তো অন্তর থেকেই করা হয়। কল্‌ব প্রার্থনার মূলকেন্দ্র ও ভিত্তিস্বরূপ। আর অন্যসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সেটার অনুগামী ও আজ্ঞাবহ। যেভাবে হুযুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন–

اَنَّ فِيْ جَسَدِ اِبْنِ اٰدَمَ مُضْغَةٌ فَاِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ اْلجَسَدُ كُلُّهُ وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ اْلجَسَدُ كُلُّهُ ، اَلاَوَهِيَ الْقَلْبُ ،

–আদম সন্তানের শরীরে একখণ্ড মাংসপিণ্ড রয়েছে। যখন সেটা ঠিক থাকে মানুষের সমস্ত শরীর ঠিক থাকে। আর যখন সেটা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয় তখন সমস্ত শরীর বিপর্যস্ত হয়ে যায়। আর সেটা হল কলব বা অন্তকরণ।[১]

শরীয়তের নামাযের জন্য দিন ও রাতে পাঁচটি সময় নির্ধারিত রয়েছে। আর সুন্নাত হল সেগুলো লৌকিকতা, আত্মপ্রদর্শন ও কপটতা বর্জন করে মসজিদে গিয়ে ইমামের পেছনে জামাত সহকারে আদায় করা। কিন্তু তরীকতের নামাযের জন্য কোন বিশেষ সময় নির্ধারিত নেই, তা সার্বক্ষণিকভাবে আদায় করা চায়। কারণ, জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই গুরুত্বপূর্ণ। এ নামায আদায়ের মসজিদ হল অন্তর। এর জামাআত বাতিনী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়, যেগুলো বাতিনী জিহ্বা দ্বারা আসমাউল হুসনার যিক্‌রে ব্যাপৃত থাকে। এসব বাতিনী অঙ্গ-প্রতঙ্গের ইমাম হল কলবের প্রেমাবেগ। এর কিবলা হল স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার সত্তা ও তাঁর অমুখাপেক্ষীতার সৌন্দর্য। যেটাকে কিবলায়ে হাকীকত নামে নামকরণ করা হয়। কলব ও রূহ উভয়টিই সর্বক্ষণ এ

[১]. হক্কী : তাফসীর-ই হক্কী, ৬/১২৪

নামাযে নিবীড়ভাবে তন্ময় থাকে। কলব নিদ্রিত হয় না, মৃত্যুবরণও করে না। বরং শয়নে-জাগরণে সর্বাবস্থায় বাতিনী নামায আদায়ে নিয়োজিত থাকে। বাতিনী কিংবা অন্তরের নামায আত্মার সজীবতার মধ্যে সম্পন্ন হয়। তাতে না শব্দ আছে আর না কিয়াম ও বৈঠক বরং তাতে শুধুমাত্র রাসূলে পাকের অনুকরণে অসীমগুণের আধার মহামহিম রবকে সম্বোধন করা হয়। যেমন−

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

−হে আল্লাহ! আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি।[1]

এ আয়াতে কারীমার ব্যাখ্যা তাফসীরে কাযীতে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাতে খোদাতত্ত্ব-জ্ঞানীর (عارف) অবস্থাদির ইঙ্গিত রয়েছে। অর্থাৎ তার জন্য পর্দাসমূহ উন্মোচিত হয়ে যায় এবং একক মালিকের দরবারে উপস্থিতির সৌভাগ্য নসীব হয়ে যায়। অতঃপর সে আল্লাহ তা'আলার বিশেষ নৈকট্যধন্যদের মধ্যে স্থান পেয়ে যায়। যাদের ব্যাপারে সায়্যিদে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন−

اَلْاَنْبِيَاءُ وَالْاَوْلِيَاءُ يُصَلُّوْنَ فِيْ قُبُوْرِهِمْ كَمَا يُصَلُّوْنَ فِيْ بُيُوْتِهِمْ،

−সম্মানিত নবী-রাসূল ও ওলীগণ স্ব-স্ব কবরে ঐভাবে নামায আদায় করেন। যেভাবে তারা আপন গৃহে নামায আদায় করতো।[2]

অর্থাৎ তারা সজীব অন্তরে যিক্‌র-আযকারে ব্যাপৃত থাকে। অতঃপর যখন জাহেরী ও বাতিনী নামায একত্রিত হয়ে যায় তখন নামায পূর্ণতায় উপনীত হয়। এর মহান পুরস্কার হিসেবে একক ও অমুখাপেক্ষী রবের দরবারে রুহানী সান্নিধ্য ও বেহেশতে শারীরিক বিশেষ পদমর্যাদা দান করা হয়। এরূপ নামায আদায়কারী জাহেরীভাবে আবেদ ও বাতিনী দিক থেকে আরেফ হয়ে থাকে। যদি আত্মার চিরন্তন জীবন হাসিল না হয় তাহলে শরীয়ত ও তরীকতের নামাযে সমতা ও সংশ্লিষ্টতা লাভ হয় না। তার নামায অপূর্ণ থেকে যায়। তার বিনিময় শুধুমাত্র পদমর্যাদার উন্নতির মাধ্যমে দেয়া হয়। কিন্তু সে আল্লাহর সান্নিধ্য প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত থাকে।

[1]. আল কুরআন : সূরা ফাতিহা, ১/৫
[2]

পঞ্চদশ অধ্যায়

মারিফাতের পবিত্রতা

মারিফাতের পবিত্রতা দু'প্রকার। যথা−

১. এমন পবিত্রতা যেটা দ্বারা আল্লাহর গুণাবলীর মারিফাত অর্জিত হয়।
২. এমন পবিত্রতা যেটা দ্বারা আল্লাহর যাত (সত্তার) মারিফাত হাসিল হয়।

আল্লাহর গুণাবলীর মারিফাতের পবিত্রতা (কামিল পীর ও মুর্শিদের) দীক্ষা গ্রহণ, হৃদয়দর্পণে আল্লাহর যিক্‌র জারী এবং মানবীয় ও পাশবিক কু-রিপু ধ্বংস করা ব্যতীত অর্জিত হতে পারে না। (অর্থাৎ প্রবৃত্তির তাড়না ও কুস্বভাব থেকে যতক্ষণ অন্তঃকরণ পবিত্র হবে না ততক্ষণ এটা অর্জন সম্ভব নয়)। আর যখন হৃদয়দর্পণ আল্লাহর সিফাতী জ্যোতি দ্বারা অন্তর্দৃষ্টি অর্জন করে তখন এটার মাধ্যমে হৃদয়দর্পণে আল্লাহর সৌন্দর্যের প্রতিবিম্ব দর্শন করে। যেমন রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন−

اَلْمُؤْمِنُ يَنْظُرُ بِنُوْرِ اللهِ،

−ঈমানদার আল্লাহর পবিত্র নূর দ্বারা দেখেন।[1]

আরো ফরমান−

اَلْمُؤْمِنُ مِرَاةُ الْقَلْبِ،

−মুমিন আত্মার দর্পণ স্বরূপ।

আরো এরশাদ করেছেন−

اَلْعَالِمُ يُنَقِّشُ وَ الْعَارِفُ يُصَقِّلُ،

−আলেম নকশা অঙ্কন করেন আর আরেফ সেটা সজ্জিত (শুভ্র) করেন।

যখন 'আসমায়ে হুসনা' দ্বারা আত্মার দর্পণ স্বচ্ছ ও পবিত্র হয়ে যায় তখন তা আল্লাহর সিফাত দর্শন করে। আর ঐ পবিত্রতা, যেটা আল্লাহর যাতের মাধ্যমে অর্জিত হয় সেটা অর্জন লতীফায়ে সির'র তাওহীদের বারটি মৌলিক নামের শেষোক্ত তিনটি নামের যিক্‌রের সাথে সম্পৃক্ত। এ যিক্‌রের প্রতিফল হল যে, 'লতীফায়ে সির'-এ যেসব বাতিনী চক্ষু থাকে সেগুলো তাওহীদের নূর দ্বারা

[1]. আবূ জাফর তাবারী : তাফসীর-ই তাবারী, ১৭/১২১; কানযুল উম্মাল, ১/১৬৫

দৃষ্টিসম্পন্ন হয়। অতঃপর যখন আল্লাহর নূর প্রকাশ পায় তখন মানবীয় অস্তিত্ব সম্পূর্ণভাবে বিলীন (فنا) হয়ে যায়। এটা বিলীনত্ব (فنا) ও চূড়ান্ত বিলুপ্তি (فناء الفنا) এর স্তর। আর এ তাজাল্লী সর্বপ্রকার জ্যোতিকে নিঃশেষ করে দেয়। যেমন মহামহিম রবের বাণী–

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ۚ (৮৮)

–আল্লাহর সত্তা ব্যতীত প্রতিটি বস্তুই ধ্বংসশীল।[১]

আরো ফরমান–

يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ ۖ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ (৩৯)

–আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা রহিত করেন আর যা ইচ্ছা প্রতিষ্ঠিত রাখেন, আর মূল কিতাব তো তারই নিকট।[২]

অতএব পবিত্র আত্মা (রূহে কুদ্‌সী) আল্লাহরই জন্য নির্দিষ্ট। আর তা আল্লাহ তা'আলার নূর দ্বারা আল্লাহ তা'আলাকে তুলনা ও উপমাহীন রূপে দর্শন করতে থাকবে। মহান প্রতিপালকের বাণী–

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۖ (১১)

–তাঁর তুল্য কিছুই নেই।[৩]

তখন শুধুমাত্র আল্লাহর নূরই থাকবে। এর পরবর্তী অবস্থা ও কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে কোন সংবাদ ও বিবরণ দেয়া যেতে পারে না। কারণ, সেটা ফানা বা বিলীনত্বের জগত। আর সেখানে বিবেক-বুদ্ধির কোনরূপ অনুপ্রবেশও নেই, যা ঐ সব কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে অবহিত করতে পারে। আর না ঐ স্তরে আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব ব্যতীত অন্য কোন ভেদ বিদ্যমান আছে। যেমন নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান–

لِيْ مَعَ اللهِ وَقْتٌ لَا يَسْعَنِيْ فِيْهِ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ ،

[১]. আল কুরআন : সূরা কাসাস, ২৮/৮৮
[২]. আল কুরআন : সূরা রায়াদ, ১৩/৩৯
[৩]. আল কুরআন : সূরা শুরা, ৪২/১১

–আল্লাহ তা'আলার সাথে আমার বিশেষ সান্নিধ্যের এমন একটি মুহূর্তও রয়েছে যাতে না কোন নৈকট্যধন্য ফেরেশতা নিকটবর্তী হতে পারে আর না কোন রাসূল।

অতএব এটা একাকীত্বের জগৎ। যেখানে গাইরুল্লাহর অস্তিত্বের কোন অবকাশ নেই। যেমন হাদীসে কুদসীতে রয়েছে–

تَجَرَّدْ وَ تَصِلْ اِلَيَّ ،

–সবকিছু পরিত্যাগ কর এবং আমার মিলন লাভে অগ্রসর হও।

সবকিছু থেকে পৃথক হয়ে যাও, তারপর আমাকে পাবে। তাজরীদ দ্বারা উদ্দেশ্য হল মানবীয় গুণাবলী সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দেয়া। অতঃপর আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হয়ে বাকার মর্যাদা অর্জন করা যায়। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন–

تَخَلَّقُوْا بِاَخْلَاقِ اللهِ اَيْ اِتَّصِفُوْا بِصِفَتِهِ ،

–তোমরা আল্লাহর চরিত্রে চরিত্রবান হও। অর্থাৎ আল্লাহর গুণাবলীর প্রকাশস্থল হয়ে যাও।

ষষ্ঠদশ অধ্যায়
শরীয়ত ও তরীকতের যাকাত

শরীয়তের যাকাত

শরীয়তের যাকাত হল এ যে, যখন কোন লোকের পার্থিব ধন-সম্পদ নিসাব পরিমাণ হয় তখন তার উপর যাকাত আদায় করা ফরয হয়ে যায়। আর তাকে প্রত্যেক বছর নির্দিষ্ট সময়ে শরীয়তের নির্ধারিত পরিমাণ অনুযায়ী যাকাতের হকদারকে প্রদান করতে হয়।

তরীকতের যাকাত

এটা আখিরাতের উপার্জন থেকে দ্বীন ও ঈমানের দরিদ্র ও নিঃস্বদের মাঝে বন্টন করতে হয়। (অর্থাৎ সৎ ও পুণ্যময় আমলের প্রচার করা, যাদের নিকট পরজগতের পাথেয় নেই তাদেরকে সৎআমলের দিশা দিয়ে পরকালীন পুঁজি সঞ্চয়ে সহায়তা করা)। কুরআন মজীদে যাকাতকে সাদ্‌কা নামে অভিহিত করা হয়েছে। যেমন এরশাদ হয়েছে–

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ ﴿٦٠﴾

–নিশ্চয় সাদ্‌কা দরিদ্রদের জন্য।[১]

কারণ, ঐ সাদ্‌কা ফকীরদের হাতে পৌছার পূর্বেই আল্লাহর কুদরতী হাতে পৌছে যায়। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, যে ব্যক্তিই ঐ সাদ্‌কা নিঃস্বদেরকে প্রদানে হাত প্রসারিত করে আল্লাহ্ তা'আলা তা কবুল করে নেন। তরীকতের যাকাত সার্বক্ষণিক দিতে হয়। এটার কোন সময় নির্ধারিত নেই। এর দ্বারা উদ্দেশ্য ঈসালে সাওয়াব করা। যখন ঈমানদার ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির অভিপ্রায়ে স্বীয় সাদ্‌কার সাওয়াব গুণাহগারদের আত্মার উদ্দেশ্যে নিবেদন করে, আল্লাহ তা'আলা তার শরয়ী অপরাধসমূহ মার্জনা করে দেন। তখন সে এমন পর্যায়ে উপনীত হয় যে, অন্যদেরকে সাওয়াব প্রদান করতে করতে সে নিজেই নিঃস্ব হয়ে পড়ে। আর আল্লাহ তা'আলা এরূপ দানশীলতা ও নিঃস্বতাকে পছন্দ করেন। যেমন হুযুর নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান–

[১]. আল কুরআন : সূরা তাওবা, ৯/৬০

اَلْمُفْلِسُ فِيْ أَمَانِ اللهِ ،

–নিঃস্ব আল্লাহর জিম্মায় রয়েছে।[১]

হযরত রাবেয়া বসরী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বলেন, "হে আল্লাহ! দুনিয়াতে আমার জন্য নির্ধারিত অংশ কাফেরদেরকে এবং পরকালের অংশ ঈমানদারদেরকে দান করে দাও। আমি দুনিয়াতে তোমার যিক্‌র ও স্মরণ ব্যতীত কিছু চাই না আর আখিরাতে তোমার দীদার ও দর্শন ব্যতীত আমার অন্য কিছুর প্রয়োজন নেই।" অতএব যে মানুষ তার জীবন ও সম্পদ মহান মনিবের জন্য উৎসর্গ করেছে, আল্লাহ তা'আলা তাকে হাশরের দিন একটি পুণ্যের বিনিময়ে দশটি পুণ্য দান করবেন। যেমন মহান রবের বাণী–

مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُۥ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ﴿١٦٠﴾

–যে বান্দা একটি পুণ্য নিয়ে আসে তার জন্য দশটি পুণ্য রয়েছে।[২]

তরীকতের যাকাতের অর্থই হল আত্মাকে প্রবৃত্তির তাড়না থেকে পবিত্র রাখা। মহান প্রতিপালকের ফরমান–

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ﴿٢٤٥﴾

–অতএব কেউ আছো, যে আল্লাহকে 'উত্তম কর্জ' দেবে? তবে আল্লাহ তার জন্য অনেক গুণ বর্ধিত করবেন।[৩]

আরো এরশাদ করেন–

قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّىٰهَا ﴿٩﴾

–নিশ্চয় সেই কৃতকার্য হয়েছে, যে নিজেকে পবিত্র করেছে।[৪]

[১]. মোল্লা আলী কারী : মিরাতুল মাফাতীহ, ১৫/১৩৫
[২]. আল কুরআন : সূরা আন'আম, ৬/১৬০
[৩]. আল কুরআন : সূরা বাকারা, ২/২৪৫
[৪]. আল কুরআন : সূরা শামস, ৯১/৯

এ পবিত্র আয়াতে কর্জ দ্বারা উদ্দেশ্য হল, আল্লাহর রাস্তায় কোন খোটা ও উপকারের আশা ব্যতীত শুধুমাত্র ঐ মহান রবের সন্তুষ্টির লক্ষ্যে সস্নেহে আপন সৎকর্ম থেকে আল্লাহর বান্দাকে সাওয়াব দান করতে থাকা।

যেমন এরশাদ হয়েছে–

لَا تُبْطِلُوا۟ صَدَقَٰتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ

–তোমরা তোমাদের দান-সাদ্‌কাসমূহ খোটা ও কষ্ট দিয়ে বিনষ্ট করো না।[১]

অর্থাৎ তোমাদের দান-সাদ্‌কা দ্বারা পার্থিব ধন-সম্পদ ইত্যাদির আশা করো না (তাহলে তোমাদের এসব দান বৃথা যাবে।)

অতএব এ প্রকারের ব্যয় অর্থাৎ ঐ সম্পদ যা আল্লাহর পথে খরচ করা হবে তা নিরেট আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই হতে হবে। আর আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে নিজের প্রিয়, পছন্দনীয় ও উৎকৃষ্ট বস্তু দান করবে। যেমন এরশাদ হয়েছে–

لَن تَنَالُوا۟ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا۟ مِمَّا تُحِبُّونَ

–তোমরা কখনো পুণ্য অর্জন করতে পারবে না যতক্ষণ আল্লাহর পথে (তাঁর সন্তুষ্টির জন্য) আপন প্রিয়বস্তু ব্যয় করবে না।[২]

---

[১]. আল কুরআন : সূরা বাকারা, ২/২৬৪
[২]. আল কুরআন : সূরা আলে ইমরান, ৩/৯২

সপ্তম অধ্যায়

শরীয়ত ও তরীকতের রোযা

শরীয়তের রোযা হল, ঈমান সহকারে ইবাদতের নিয়তে সাহরী থেকে ইফতার পর্যন্ত পানাহার ও প্রবৃত্তির কামনা থেকে নিজেকে বিরত রাখা। আর তরীকতের রোযা হল ঈমানদার ব্যক্তির প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে, দিনে ও রাতে সর্বাবস্থায় যাবতীয় হারাম ও নিষিদ্ধ কর্ম থেকে বিরত থাকা, অহংকার, ধোঁকা, পরনিন্দাসহ সকল প্রকার অসৎকর্ম ও কু-স্বভাব থেকে বিরত থাকা এবং কোন প্রকার পাপকর্মে নিবিষ্ট না হওয়া। আর যদি এক মুহূর্তের জন্যও পাপকর্ম সংঘটিত হয়ে যায় তাহলে তরীকতের রোযা বিনষ্ট হয়ে যাবে। শরীয়তে রোযার সময় নির্ধারিত কিন্তু তরীকতের রোযা সার্বক্ষণিক এবং তা আজীবন রাখতে হয়। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন–

رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صَوْمِهِ اِلاَّ الْجُوْعُ وَالْعَطَشُ ،

–অনেক রোযাদার এমনও রয়েছে যাদের রোযা থেকে ক্ষুধা ও তৃষ্ণা ব্যতীত কিছুই অর্জিত হয় না।[১]

আরো ফরমান–

كَمْ مِنْ صَائِمٍ مُفْطِرٌ وَكَمْ مِنْ مُفْطِرٍ صَائِمٌ ،

–অনেক রোযাদার ব্যক্তি ইফতারকারী আর অনেক ইফতারকারী ব্যক্তি রোযাদার হয়ে থাকে।

অর্থাৎ অনেক রোযাদার সত্যিকারার্থে রোযা রাখে এবং স্বীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে যাবতীয় অপকর্ম থেকে নিরাপদ রাখে। পক্ষান্তরে অনেক রোযাদার নামসর্বস্ব রোযা রাখে। রোযা পালন করা সত্ত্বেও তারা নিষিদ্ধ ও অবৈধ কার্যাদি থেকে নিজকে সংবরণ করে না। তারা নিশ্চিতভাবে রোযার সাওয়াব থেকে বঞ্চিত থাকবে। হাদীসে কুদসীতে রয়েছে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

اَلصَّوْمُ لِيْ وَ اَنَا اَجْزِيْ بِهٖ ،

–রোযা আমার জন্য এবং এর প্রতিদান আমি নিজেই দেব।[১]

---

[১]. ইবনে আদী : আল কামেল, ৬/৪০২

নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন–

لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ الْإِفْطَارِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ رُؤْيَتِهِ،

–রোযাদারের জন্য দু'টি আনন্দঘন মুহূর্ত রয়েছে, একটি ইফতার তথা রোযা ভঙ্গের সময় আর অপরটি আল্লাহ তা'আলার দীদার লাভের সময়।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তাঁর দীদারের মহান সৌভাগ্য দান করুন! আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কৃপা ও অনুগ্রহে আমাদেরকে তাঁর দীদারের মহান নিয়ামত দান করবেন। শরীয়তের আলিমগণ বলেন, ইফতার (افطار) দ্বারা উদ্দেশ্য হল সূর্যাস্তের সময় রোযা ভঙ্গ করার মুহূর্ত আর رويت (দেখা) দ্বারা উদ্দেশ্য হল ঈদের চাঁদ। অর্থাৎ ঈদের চাঁদ দেখে খুশী উদযাপন করা। কিন্তু তরীকতপন্থী আলিমগণ বলেন, ইফতার (افطار) দ্বারা উদ্দেশ্য হল জান্নাতে প্রবেশের মুহূর্ত, যখন তরীকতের রোযা পালনকারীরা আনন্দে উৎফুল্ল হবে। কারণ, তরীকতের রোযা স্থায়ী ছিল আর এখন জান্নাতে নেয়ামতরাজি প্রাপ্তির পর তাদের ইফতারের সময় হয়েছে। অতএব সেখানে তারা যেসব নেয়ামত প্রাপ্ত হবে তা দ্বারা তরীকতের রোযার ইফতার করবে। আর 'দেখা' (رويت) দ্বারা উদ্দেশ্য হল কিয়ামত দিবসে 'লতীফায়ে সির'র সাহায্যে আল্লাহর সৌন্দর্য দর্শনে বিমোহিত হওয়া। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তাঁর দীদারের মহান সৌভাগ্য দান করুন। আমীন! হাকীকতের রোযা হল, অন্তরকে মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্যসব কিছুর ধ্যান থেকে অভুক্ত ও তৃষ্ণার্ত রাখা। আর আল্লাহ তা'আলা ভিন্ন অন্য কারোর দর্শন করা থেকে চোখকে বিরত রাখা জরুরী। হাদীসে কুদসীতে রয়েছে–

اَلْإِنْسَانُ سِرِّيْ وَاَنَا سِرُّهُ،

–মানুষ আমার গুপ্তরহস্য আর আমি তার গুপ্তরহস্য।

অতএব 'গুপ্তরহস্য (سر) হচ্ছে আল্লাহর জ্যোতি। সেটার প্রতি মোহাবিষ্ট হওয়ার পর মানুষ অন্য কোন দিকে নিবিষ্ট হতে পারে না। কারণ ইহ ও পরজগতে মহামহিম রব ব্যতীত কেউই প্রিয়, পছন্দনীয় ও কাম্য নয়।

[১]. বোখারী : আস্‌ সহীহ, ২৩/১১; মুসলিম : আস্‌ সহীহ, ৬/১৯; নাসায়ী : আস্‌ সুনান, ৭/৩৯৪

যদি মানুষ গায়রুল্লাহর প্রেমে আকৃষ্ট হয়ে যায় তখন তার হাকীকত ও তরীকতের রোযা বিনষ্ট হয়ে যায়। এ রোযার কাযা হল অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে পার্থিব ও অপার্থিব বস্তুর ভালবাসা দূর করে আল্লাহর প্রেমে একাগ্র হওয়া।

হাদীসে কুদসীতে রয়েছে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

اَلصَّوْمُ لِيْ وَ اَنَا اَجْزِيْ بِهِ،

–রোযা আমার জন্য, এর প্রতিদান আমি নিজেই দেব।[১]

[কতিপয় আলেম اَجْزِيْ بِهِ কিংবা اَجْزَءُ بِهِ শব্দমালাও বর্ণনা করেছেন। যার অর্থ- রোযা আমার জন্য আর সেটার প্রতিদান আমি নিজেই। অর্থাৎ এর বিনিময় আমার দীদারই। وَاللهُ تَعَالي وَ حَبِيْبِهِ الْاَعَلي اَعْلَمْ]

[১]. বোখারী : আস্‌ সহীহ, ২৩/১১; মুসলিম : আস্‌ সহীহ, ৬/১৯; নাসায়ী : আস্‌ সুনান, ৭/৩৯৪

অষ্টাদশ অধ্যায়
শরীয়ত ও তরীকতের হজ্জ

শরীয়তের হজ্জ

শরীয়তের হজ্জ হল শরীয়তের রুকন, শর্তাবলী, ফরয ও সুন্নাতসমূহ আদায়ের মাধ্যমে বায়তুল্লাহ্ শরীফের হজ্জ করা, যেন সাওয়াব অর্জিত হয়। শর্তাবলী আদায়ে কোনরূপ শিথিলতা কিংবা অতিরঞ্জনের কারণে গ্রহণযোগ্যতা এবং সাওয়াবেও কম-বেশী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অনেক সময় হজ্জ সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়ে যায়। কারণ, মহান আল্লাহর নির্দেশ হল–

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ ،

–হজ্জ ও ওমরা নিরেট আল্লাহরই উদ্দেশ্যে পূর্ণ কর।[১]

শরীয়তের হজ্জের শর্তাবলী

- স্ব-স্ব মীকাত থেকে ইহ্‌রাম বাঁধা।
- মক্কায়ে মুয়াজ্জামায় প্রবেশ করা।
- তাওয়াফে কুদুম করা (বায়তুল্লাহর প্রথম তাওয়াফ)।
- সাফা ও মারওয়া সায়ী করা।
- আরাফার দিন আরাফা প্রান্তরে অবস্থান করা।
- মুযদালিফায় রাতযাপন করা।
- মীনায় কুরবানী করা।
- চুল মুণ্ডন কিংবা খাটো করা।
- বায়তুল্লায় উপস্থিত হওয়া।
- বায়তুল্লাহ শরীফ সাতবার প্রদক্ষিণ করা।
- যমযমের পানি পান করা।
- মকামে ইবরাহীমের নিকট তাওয়াফ আদায়ের নিমিত্তে দু'রাকাত নামায আদায় করা।

১. আল কুরআন : সূরা বাকারা, ২/১৯৬

হজ্জের শর্ত ও ফরযসমূহ আদায়ের পর ঐসব কাজ বৈধ হয়ে যায় যা ইহরামাবস্থায় নিষিদ্ধ ছিল।

শরীয়তের হজ্জ পালনের প্রতিদান হল দোযখ থেকে পরিত্রাণ ও আল্লাহর পাকড়াও থেকে নিরাপত্তা লাভ করা।

যেমন মহান রবের বাণী–

وَمَن دَخَلَهُۥ كَانَ ءَامِنًا ۗ ﴿٩٧﴾

–যে বায়তুল্লাহ শরীফে প্রবেশ করল তাকে নিরাপত্তা দান করা হল।[১]

পরিশেষে তাওয়াফে সদর করা, যেটাকে তাওয়াফে বিদা কিংবা তাওয়াফে রুখসত বলা হয়। এরপর স্ব-স্ব আবাস ও গন্তব্যে প্রস্থান করা। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে হজ্জ ও ওমরা পালনের তাওফীক নসীব করুন। আমীন!

তরীকতের হজ্জ

তরীকতের হজ্জের জন্য পাথেয় ও বাহন ইত্যাদির সর্বপ্রথম পর্যায় হল যে, কোন কামিল মুর্শিদের দীক্ষা লাভ ও তার নির্দেশনা অনুযায়ী আমল করা। অতঃপর তার সাহচর্যে হজ্জের পদ্ধতি শিক্ষা করা, রসনাকে সর্বাবস্থায় যিক্র-আযকারে ব্যাপৃত রাখা এবং হজ্জের প্রকৃতি (حقيقت) ও লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখা। অর্থাৎ যিক্রের সাথে সাথে গভীর ধ্যানে মগ্ন হওয়া। যিক্র দ্বারা কালেমায়ে তাওহীদ অর্থাৎ لاإله إلا الله محمد رسول الله উদ্দেশ্য। যখন এ যিক্র দ্বারা অন্তরের সজীবতা ও স্বাচ্ছন্দ্য লাভ হবে তখন এভাবে গোপন (باطن) যিক্রে লিপ্ত হয়ে যাবে যে, প্রথমে আল্লাহর গুণবাচক নামসমূহের যিক্র করতে থাকবে যতক্ষণ না অন্তকরণ (باطن) পরিস্কার ও স্বচ্ছ হয়, যেন সির লতীফার বাতিনী কা'বায় আল্লাহ তা'আলার গুণাবলীর সৌন্দর্যের নূরে জ্যোতির্ময় হয়ে যায়। যেমন আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালামকে নির্দেশ প্রদান করেন–

أَن طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِينَ وَٱلْعَٰكِفِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ ﴿١٢٥﴾

১. আল কুরআন : আলে ইমরান, ৩/৯৭

–আমার এ ঘরকে (কা'বা) পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবে প্রদক্ষিণকারী, অবস্থানকারী এবং রুকু ও সিজদাকারীদের জন্য।[১]

জাহেরী কা'বা তথা বায়তুল্লাহ শরীফকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রাখা আল্লাহর সৃষ্টির ঐসব ঈমানদারদের জন্য আবশ্যক যারা ঐ গৃহের তাওয়াফ করে। আর বাতিনী কা'বা তথা মুমিনের অন্তর পরিস্কার রাখা প্রকৃত খোদাতত্ত্ব-জ্ঞানীদের (عارف) উপর ফরয, যারা আল্লাহর নৈকট্য অনুসন্ধানী। ঐ মহান সত্তার বিকাশ ও জ্যোতি দ্বারা ধন্য হওয়ার উত্তমপন্থা হল, আপন অন্তরকে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর (গায়রুল্লার) ধারণা থেকে পরিস্কার রাখা। যেভাবে জাহেরী হজ্জের জন্য বিভিন্ন শর্ত ও ফরয ইত্যাদি আদায় করা জরুরী তেমনি তরীকত তথা বাতিনী হজ্জের ক্ষেত্রেও ঐসব শর্ত ও ফরযসমূহ আদায় করা অত্যাবশ্যক। যেভাবে জাহেরী হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধা হয় তেমনি বাতিনী হজ্জেরও ইহরাম রয়েছে, ঐ ইহরাম রূহে-কুদসীর নূর দ্বারা বাঁধা হয়। অতঃপর হৃদয়ের কা'বায় (অন্তরে) প্রবেশ করতে হয়, যেটা মুনাজাত ও প্রার্থনার স্থান। এরপর তাওয়াফে কুদুম হল দ্বিতীয় নামের যিক্‌র অর্থাৎ সর্বক্ষণ الله الله যিক্‌রে লিপ্ত থাকা। এরপর 'কলবের আরাফাত'- এর প্রান্তরে গিয়ে প্রার্থনা করা। যেখানে অবস্থানের নিয়ম হল তৃতীয় নাম অর্থাৎ هو هو -এর যিক্‌র করা। এরপর চতুর্থ নামের (حق حق) যিক্‌র করে করে রাতযাপনের জন্য মুযদালিফার দিকে গমন করবে। অর্থাৎ বাতিনী অন্তরের প্রতি নিবিষ্ট হবে। সেখানে এক সাথে পঞ্চম ও ষষ্ঠ নাম (ياحي يا قيوم) এর যিক্‌র করবে। এটা যেন আরাফা ও মুযদালিফার আত্মিক (روحاني) মিলন। (এর রহস্য হল আরাফায় জোহর ও আসরের নামায একত্রে আদায় করা এবং মাগরিব ও এশা রাতের যে-কোন অংশে মুযদালিফায় পৌঁছে আদায় করা। যেটা মাগরিবের বিশুদ্ধ ও বৈধ সময় হিসেবে পরিগণিত হবে। এখানেও যেন ياحي ياقيوم যিক্‌রদ্বয়ের মাধ্যমে যোহর ও আসর এবং মাগরিব ও এশার সমাবেশ ঘটল) এরপর মীনা অর্থাৎ সির লতীফার প্রতি নিবিষ্ট হবে, যেটা হারামাইনে শরীফাইনের অন্তবর্তী স্থানে অবস্থিত। আর এ স্থানদ্বয়ের মধ্যে অবস্থান করত সপ্তম নামের যিক্‌র করে অর্থাৎ ياقهار ياقهار বলে

[১]. আল কুরআন : সূরা বাকারা, ২/১২৫

প্রশান্তচিত্তের (نفس متمئن) কুরবানী আদায় করবে। কারণ, এ নাম ফানা হওয়া এবং যা কুফরীকে ধ্বংস ও নস্যাৎ করার ক্ষেত্রে কার্যকর ও সহায়ক। নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন–

اَلْكُفْرُ وَالْاِيْمَانُ مَقَامَانِ مِنْ وَّرَاءِ الْعَرْشِ ،

–কুফর ও ঈমান আরশের পেছনে দু'টি স্থানের নাম, যেগুলো আল্লাহ ও বান্দার মধ্যখানে আড়াল স্বরূপ।

অর্থাৎ কুফর ও ঈমান আরশের সীমান্তের দু'টি স্থানের নাম।

এ দু'টির মধ্যে একটি কালো ও অন্যটি সাদা বর্ণের। নফসে মুতমায়িন্নার যবেহের পর এখন কাজ হল খলক তথা চুল মুণ্ডানো কিংবা খাটো করা। তরীকতের হজ্জে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল রূহে-কুদসীকে অষ্টম নামের যিক্‌রের মাধ্যমে মানবীয় গুণাবলী থেকে পবিত্র করা। এরপর নবম নামের যিক্‌রে মনোনিবেশ করবে এবং রূহানী হেরমে প্রবেশের চেষ্টা করবে। যখন সেখানে প্রবেশের সুযোগ ও সৌভাগ্য লাভ হবে তখন রূহানী ইতিকাফকারীদেরকে অন্ত দৃষ্টি দ্বারা স্বচক্ষে দর্শন করবে। অতঃপর দশম নামের যিক্‌রের তন্ময়তার সাথে প্রেম ও সান্নিধ্যের স্তরে নিজেই ইতিকাফ করবে এবং আকার ও উপমাহীন রূপে ঐ মহান ও পবিত্র সত্তার সৌন্দর্যের দৃশ্য অবলোকনে ধন্য হবে। এরপর আসমায়ে হুসনার একাদশ নামের যিক্‌রের মাধ্যমে সাত চক্কর তাওয়াফ পূর্ণ করবে। এ নিরন্তর যিক্‌রের দ্বারা তরীকতের হজ্জের তাওয়াফ সম্পন্ন হবে। যেটা শরীয়তের হজ্জের বিধানের বায়তুল্লাহ শরীফ সাতবার প্রদক্ষিণের নিয়মের অনুরূপ। অতঃপর অতি সান্নিধ্যের স্তরে উপনীত হয়ে দ্বাদশ নামের পাত্র থেকে কুদরতী হাতে পবিত্র পানীয় (شراب طهور) পানে পরিতৃপ্ত হবে। যেমন মহান আল্লাহর বাণী–

وَسَقٰىهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُوْرًا ﴿٢١﴾

–এবং তাদেরকে তাদের রব পবিত্র পানীয় পান করাবেন।[১]

এরপর রহস্যের পর্দা উন্মোচিত হয়ে যাবে। আর তখন ঐ অবিনশ্বর সত্তাকে তাঁরই জ্যোতির সাহায্যে বিনা পর্দায় দর্শন করবে। এটা আল্লাহ তা'আলার ঐ বাণীর ভাষ্য যা হাদীসে কুদসীতে বিধৃত হয়েছে–

[১]. আল কুরআন : সূরা দাহর, ৭৬/২১

مَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلاَ أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلاَخَطَرَ عَلَي قَلْبِ بَشَرٍ ،

–(খোদাতত্ত্ব-জ্ঞানীরা ঐ মহান নিয়ামত প্রাপ্ত হবে) যা না কোন চক্ষু অবলোকন করেছে আর না কোন কান শ্রবণ করেছে এবং না কোন মানুষের অন্তরে সেটা সম্বন্ধে ধারণার উদয় হয়েছে।

অধিকন্তু সে আল্লাহর বাণী বর্ণ ও ধ্বনিহীনভাবে শ্রবণ করবে। সত্যিই وَلاَخَطَرَ عَلَي قَلْبِ بَشَرٍ এর অন্য অর্থ হল, আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভের আকাঙ্খা ও সম্বোধন শ্রবণ করা।

অতএব প্রতীয়মান হল যে, আল্লাহর গুণবাচক নামসমূহের যিক্‌র ও যিক্‌রের পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে পাপসমূহ পূণ্যে পরিবর্তন করে দেয়া হয় এবং এরপর ঐসব কাজ যা (ইহরামাবস্থায়) নিষিদ্ধ ও অবৈধ ছিল তা বৈধ হয়ে যায়। যেভাবে শরীয়তের হজ্জ সমাপ্তির পর নিষিদ্ধ কার্যাবলী বৈধ হয়ে যায়। মহান রবের বাণী–

مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَٰلِحًا فَأُوْلَٰٓئِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّـَٔاتِهِمْ حَسَنَٰتٍ ۗ ﴿٧٠﴾

–যে তাওবা করেছে, ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে আল্লাহ তার পাপরাশি পুণ্যে পরিবর্তন করে দেবেন।[১]

অতঃপর প্রবৃত্তির তাড়না ও কামনা থেকে মুক্ত হয়ে চিন্তাহীন ও ভয়শূন্য হয়ে যাবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন–

أَلَآ إِنَّ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

–জেনে নাও! আল্লাহর ওলীদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।[২]

আল্লাহ তা'আলা আপন কৃপা ও অনুগ্রহে এ পদমর্যাদার মহান সৌভাগ্য আমাদেরকে দান করুন। আমীন! তারপর শরীয়তের হজ্জের তাওয়াফে সদর

---

[১]. আল কুরআন : সূরা ফুরকান, ২৫/৭০
[২]. আল কুরআন : সূরা ইউনুস, ১০/৬২

(বিদায়ী তাওয়াফ) সেটা সমাপ্তিলগ্নে সম্মানিত হাজীগণ করে থাকেন তা তরীকতের হজ্জেও করা। যেটা আল্লাহর গুণবাচক নামসমূহের যিক্‌রের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। অতঃপর শরীয়তের হজ্জের ন্যায় তরীকতের হজ্জেও আপন ঠিকানায় প্রত্যাগমন করতে হয়। অর্থাৎ আলমে-কুদস ও আলমে-আহসানি তাকভীম-এর দিকে প্রত্যাবর্তন করা। এটা দ্বাদশ নামের যিক্‌রের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।

উল্লেখিত বর্ণনা তো ভাষা ও বিবেকের গণ্ডিতে রয়েছে। কিন্তু এর পরবর্তী বিষয়াদি বর্ণনাই করা যেতে পারে না। ওই ব্যাপারে কিছু ধারণা করাও সম্ভব নয়। কারণ, সেখানে বিবেক ও বুদ্ধির অনুপ্রবেশ নেই এবং সাহস ও উদ্যম সেটার আভাসও পায় না। মস্তিষ্কসমূহে সেটা ধারণ করার ক্ষমতা নেই।

যেমন, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন–

إِنَّ مِنَ الْعُلُوْمِ كَهَيْئَةِ الْمَكْنُوْنِ لاَيَعْلَمُهَا اِلاَّ الْعُلَمَاءُ بِاللهِ ،

–নিশ্চয় কিছু জ্ঞান আড়ালাবৃত রয়েছে সেগুলো আলেম বিল্লাহ (অর্থাৎ আরেফ বিল্লাহ)গণ ব্যতীত কেউ জ্ঞাত নন।[১]

যখন তারা এসব জ্ঞান দ্বারা কাজ করেন তখন সম্মানিত বুযুর্গগণ তা অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করেন না। খোদাতত্ত্ব-জ্ঞানীই (আরেফ) ঐ জ্ঞানের সুগভীরে উপনীত হয়। অতঃপর তার আলোচনা ও বাক্যালাপ হাকীকতের অবস্থানুযায়ী হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে দুনিয়াবী আলিমের তো জ্ঞানের ঊর্ধাবরণের সাথেই সম্বন্ধ থাকে মাত্র। কারণ, তার সম্বন্ধ জাহেরী জ্ঞানার্জন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে। আর আরিফের জ্ঞান তো আল্লাহর গুঢ় রহস্যের আধার হয়ে থাকে, অন্যরা সেগুলো অবগত হয় না। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী–

وَلَا يُحِيطُونَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَ ﴿٢٥٥﴾

–আর তারা তাঁর জ্ঞানের কিছুই বেষ্টন করতে পারে না, তবে তিনি যাকে যতটুকু ইচ্ছা দান করেন।[২]

---

[১]. হক্কী : তাফসীর-ই হক্কী, ১/৯৭
[২]. আল কুরআন : সূরা বাকারা, ২/২৫৫

অর্থাৎ সম্মানিত নবী ও ওলীগণ যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বিশেষ জ্ঞান দানে ধন্য করেছেন। নিশ্চয় তিনি অদৃশ্য ও গুপ্ত রহস্যাদি সম্পর্কে জ্ঞাত। তিনি ব্যতীত কেউই ইবাদতের উপযুক্ত নয়। গুণবাচক সুন্দরনামসমূহ তাঁরই এবং তিনিই সর্বজ্ঞানী ও উত্তম পরিজ্ঞাতা।

উনবিংশ অধ্যায়
ওয়াজদ ও কলবের পরিচ্ছন্নতা

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন–

تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ

–যারা তাদের রবকে ভয় করে তাদের গাত্র রোমাঞ্চিত হয়।[১]

অর্থাৎ সেটার কারণে তাদের লোম খাড়া হয়ে যায় এবং তাদের শরীর আল্লাহর ভয়ে প্রকম্পিত হয়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলার যিক্‌রের প্রবলাগ্রহ তাদেরকে গ্রাস করে এবং অন্তর কোমল হয়ে যায়। আরো এরশাদ করেন–

أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُۥ لِلْإِسْلَـٰمِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِۦ ۚ

فَوَيْلٌ لِّلْقَـٰسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ ٱللَّهِ ۚ

–আর আল্লাহ তা'আলা ঈমানের জন্য যে ব্যক্তির বক্ষ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, সে আপন প্রতিপালকের নিকট থেকে আলোর উপর রয়েছে। আর দূর্ভোগ ঐ পাষাণ ব্যক্তিদের জন্য যাদের হৃদয় আল্লাহর স্মরণের দিক থেকে কঠোর হয়ে গেছে।[২]

নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন– 'আল্লাহর প্রেমাবেগসমূহের একটি জোশ ও আবহ উভয় জগতের আমলের সমান।'

আরো এরশাদ করেন–

مَنْ لاَ وَجْدَ لَهُ لاَحَيٰوةَ لَهُ ،

–যার ওয়াজদ (প্রেমাবেগ) নেই তার জীবন নেই।

হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, ওয়াজদ যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে অন্তরে প্রবিষ্ট হয় তখন তা হয়তো আনন্দের কারণ হয় কিংবা বেদনার।

১. আল কুরআন : সূরা যুমার, ৩৯/২৩
২. আল কুরআন : সূরা যুমার, ৩৯/২২

ওয়াজদ দু'প্রকার। যথা-

১. কায়িক (جسماني) ও ২. আত্মিক (روحاني)

কায়িক ওয়াজদ

কায়িক ওয়াজদ তো প্রবৃত্তির তাড়নায় হয়ে থাকে। যা মানবীয় শক্তির সাথে সম্পৃক্ত। তাতে রূহানী আবেগ ও উদ্যমের কোন প্রভাব থাকে না। বরং তা লোকদেরকে দেখানো, শুনানো ও যশ- খ্যাতি অর্জনের জন্য কৃত্রিমভাবে হয়ে থাকে। এরূপ ওয়াজদ সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও বাতিল বলে গণ্য। কারণ, সেটা গ্রহণের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোন সফলতা নেই, বরং এটা নিছক নিজকে ধ্বংসের মধ্যে নিমজ্জিত করার সমতুল্য। এরূপ ওয়াজদ'র রূপপরিগ্রহ করা সম্পূর্ণ নাজায়েয ও অবৈধ।

রূহানী ওয়াজদ

রূহানী ওয়াজদ হল এমন এক আবেগ ও অন্তরের প্রেরণা যেটা কুরআন মজীদ তিলাওয়াত, সুমধুর ও সুললিত সুর, ছন্দপুর্ণ ভালো অর্থবোধক কবিতা ও ক্রিয়াশীল যিক্‌র, আযকার শ্রবণের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়। এরূপ ওয়াজদ ও আবেগের মধ্যে এমন শক্তি ও ইচ্ছা প্রকাশ পেয়ে যায় যা রূহানীয়তের উন্নতির মাধ্যম হয়। আর তাতে দেহে কোনরূপ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব থাকে না বরং তা ওয়াজদসম্পন্ন ব্যক্তির নিকট অনাকাঙ্খিতভাবে সৃষ্টি হয়ে যায়।

এ প্রকারের ওয়াজদ পরিগ্রহ করা বৈধ। যেমন আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন–

فَبَشِّرۡ عِبَادِ ، ٱلَّذِينَ يَسۡتَمِعُونَ ٱلۡقَوۡلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحۡسَنَهُۥٓ

–অতএব আমার ঐসব বান্দাদেরকে সুসংবাদ দিন যারা কান পেতে কথা শুনে, অতঃপর সেটার মধ্যে উত্তমের অনুসরণ করে।[১]

এভাবে আশেকদের ও পক্ষীকুলের প্রাণবন্ত সুর, সুললিত কন্ঠস্বর ও প্রভাবপূর্ণ গীতি ইত্যাদি রূহানী শক্তি বৃদ্ধির মাধ্যম। এরূপ ওয়াজদ'র মধ্যে শয়তান ও প্রবৃত্তির কোন প্রভাব ও অনুপ্রবেশ থাকে না। কারণ, প্রবৃত্তির তাড়না অন্ধকারের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে, রূহানী শক্তি ও আলোকোজ্জ্বল নূরের মধ্যে তার কোনরূপ ফন্দি ও কর্তৃত্ব চলে না। রূহানী জ্যোতিতে শয়তান পানির মধ্যে

১. আল কুরআন : সূরা যুমার, ৩৯/১৭-১৮

লবণের ন্যায় দ্রবীভূত হয়ে যায়। যেভাবে কালেমায়ে হাওকালা (لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظي) পাঠের মাধ্যমে বিগলিত ও অস্তিত্বহীন হয়ে যায়।

হাদীস শরীফে রয়েছে–

فَفِيْ قَرَائَةِ الْاٰيَاتِ وَالْاَشْعَارِ الْحِكْمَةِ وَالْمُحَبَّةِ وَالْعِشْقِ وَالْاَصْوَاتِ الْحَزِيْنَةِ قُوَّةٌ نُوْرَانِيَّةٌ لِلرُّوْحِ ،

–কুরআন করীমের তিলাওয়াত, প্রজ্ঞাপূর্ণ প্রেমময় ও আবেগময়ী কবিতা এবং শোকগাথার আওয়াজের মধ্যে আত্মার জ্যোতির্ময় শক্তি রয়েছে।

অতএব নিশ্চিতরূপে নূর আত্মার সাথে সম্পৃক্ত থাকে। মহান রবের বাণী– وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِيْنَ –পবিত্র নারী পবিত্র পুরুষদের জন্য।[১] আর যদি ওয়াজদ শয়তান ও প্রবৃত্তির আজ্ঞানুবর্তী হয় তাহলে সেখানে কোনরূপ জ্যোতি থাকে না বরং তাতে অন্ধকার আর অন্ধকারই থাকে। সেখানে কুফর ও ভ্রষ্টতার অন্ধকার সৃষ্টি হয়। এ দু'টি নফসে-আম্মারার অন্ধকার হতে সৃষ্ট। তখন সমগোত্রীয়ের মিলনে তা শক্তিশালী হয়। যেমন এরশাদ হয়েছে– الْخَبِيْثَاتُ لِلْخَبِيْثِيْنَ –অপবিত্র রমণী অপবিত্র পুরুষদের জন্য।[২] কারণ, তাদের মধ্যে রূহানী আহার্য নেই।

রূহানী ওয়াজদ আবার দু'প্রকার। যথা-

১. ইচ্ছাধীন ওয়াজদ (اختياري)। ২. ইচ্ছাহীন ওয়াজদ (اضطراري)।

ইচ্ছাধীন ওয়াজদ ঐ ব্যক্তির আবেগের ন্যায় যার দেহে কোনরূপ দুঃখ-কষ্ট ব্যথা-বেদনার নিদর্শন প্রকাশ পায় না এবং সে ব্যধিগ্রস্তও হয় না তারপরও সে কৃত্রিম ও বানোয়াটিভাবে ওয়াজদের অবস্থা নিজের মধ্যে প্রকাশ করে নেয়। তার এসব আন্দোলন ও স্পন্দন শরীয়তপরিপন্থী হবে।

আর ঐ ওয়াজদ যেটার সম্বন্ধ আচমকা ও ইচ্ছাহীনতার সাথে হয় এবং তাতে ওয়াজদ'র অবস্থা প্রকাশ পেয়ে যায়, বাহ্যিকভাবে কোনরূপ কৃত্রিমতা ও কপটতার ধারণাও না থাকে তবে তা রূহানী শক্তি লাভের মাধ্যম হবে। কারণ,

১. আল কুরআন : সূরা নূর, ২৪/২৬
২. আল কুরআন : সূরা নূর, ২৪/২৬

নফস তো ওই অবস্থা সৃষ্টিতে সক্ষম নয় বরং এরূপ আন্দোলন ও স্পন্দন তো দৈহিক স্পন্দনেরও উর্ধ্বে। যেরূপ কাপুনির দ্বারা জ্বরের প্রতাপ মানুষের মধ্যে এভাবে প্রভাব বিস্তার করে নেয় যে মানুষ তা দমনের শক্তিই রাখে না। এজন্য জ্বরাবস্থায় তার এ স্পন্দন তার ইচ্ছা ও নিয়ন্ত্রণের উর্ধ্বে। তখন সে জ্বরের কারণে বিভিন্নভাবে নড়াচড়া করতে থাকে। ঠিক এভাবেই যখন রূহানী আন্দোলন সৃষ্টি হয় তখন সেটা রূহানী ও হাকীকী ওয়াজদ হয়ে থাকে।

ওয়াজদ ও সেমা দুটি যন্ত্র স্বরূপ। যেগুলো আরেফ ও খোদা-প্রেমিকদের হৃদয়াবেগে নাড়া দেয় এবং এ দু'টি খোদাপ্রেমিকদের আহার্য ও তাদের রূহানী শক্তিবর্ধক। যেমন রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন–

اِنَّ السَّمَاعَ لِقَوْمٍ فَرْضٌ وَلِقَوْمٍ سُنَّةٌ وَلِقَوْمٍ بِدْعَةٌ وَالْفَرْضُ لِلْخَوَاصِ وَالسُّنَّةُ لِلْمُحِبِّيْنَ وَالْبِدْعَةُ لِلْغَافِلِيْنَ ،

–সেমা (ভক্তিমূলক গান) কোন কোন লোকের জন্য ফরয, কারও জন্য সুন্নাত ও কারো জন্য বিদআত। ফরয হল বিশেষ লোকদের জন্য, সুন্নাত প্রেমিকদের জন্য, আর বিদআত সাধারণ উদাসীন লোকদের জন্য।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো এরশাদ করেন–

مَنْ لَمْ يَتَحَرَّكْ بِالسَّمَاعِ وَالرَّبِيْعِ وَاَزْهَارِ وَالْعُوْدِ وَاَوْتَارِ فَهٰذَا فَاسِدُ الْمَخْرَاجِ لَيْسَ لَهُ عِلَاجٌ فَهُوَ نَاقِصٌ عَنِ الْحِمَارِ وَالطُّيُوْرِ بَلْ دَنَ كُلُّ الْبَهَائِمِ فَاِنَّ جَمِيْعَ ذٰلِكَ يَتَأَثَّرُ بِالنَّغَمَاتِ وَالْمَوْزُوْنَةِ وَلِذٰلِكَ كَانَتِ الطُّيُوْرُ تُصْطَفُ عَلَي رَأْسِ دَاوُدَ لِاَسَمَاعِ صَوْتُهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ ،

–যাকে সেমার কসীদা, বসন্তের মনোরম পরিবেশ, ফুলের সৌন্দর্য ও সৌরভ, কাঠের সুগন্ধি ও সঙ্গীতের সুরমূর্ছনা প্রভাবিত করতে পারে না, তার মস্তিস্ক অপূর্ণ (দুরন্ত নয়, সে মন্দপ্রকৃতি ও বদমেজাজসম্পন্ন লোক)। সে তো গাধা ও পক্ষীকুল বরং সমস্ত চতুস্পদ জন্তু ইত্যাদির চেয়েও হীন। কারণ, সমস্ত বন্যপ্রাণী ও পাখি সুর ও ছন্দ দ্বারা প্রভাবিত হয়। তাইতো পক্ষীকুল হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের

সুমধুর কণ্ঠস্বর শোনার জন্য তাঁর মাথার উপর একত্রিত হয়ে উড়ে বেড়াত।

হুযুর নবী করীম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন– مَنْ لَاوَجْدَ لَهُ لَا دِيْنَ لَهُ –যার ওয়াজদ নেই তার ধর্ম নেই।[১] অর্থাৎ ওয়াজদ বিহীন লোকের ধর্ম পূর্ণতা লাভ করে না। ওয়াজদের দশটি প্রকার রয়েছে। তন্মধ্যে কতগুলো প্রকাশ্য আর কতগুলো অপ্রকাশ্য। যেগুলো জাহেরী ওয়াজদ সেগুলোর প্রকাশ তো ব্যক্তির বাহ্যিক স্পন্দনের মাধ্যমে হয়ে থাকে। কিন্তু বাতিনী ওয়াজদ বাহ্যিক অবস্থার মধ্যে প্রকাশ পায় না। যেমন যখন ঐ ব্যক্তি নিবিষ্টচিত্তে আল্লাহর যিক্‌রে লিপ্ত হয়ে যায় কিংবা একাগ্রতা ও মনোসংযতি নিয়ে কুরআন করীম তিলাওয়াত করে, ক্রন্দন করে, ব্যথা ও কষ্ট অনুভব করে, চিন্তাযুক্ত ও আল্লাহর ভয়ে বিচলিত হয়ে যায় এবং বিভিন্ন কারণে যিক্‌রাবস্থায় আফসোস ও অনুশোচনা করতে থাকে তখন স্বভাবতই তার মধ্যে অনুতপ্ততা ও লজ্জা সৃষ্টি হয়ে যায়। তখন তার জাহেরী ও বাতিনী অবস্থার পরিবর্তন সাধিত হতে থাকে। আর এসব কিছুই আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ, প্রেমাবেগ ও অনুগ্রহ প্রাপ্তির উন্মাদনার স্পন্দন (ওয়াজদ)। অতঃপর তার মধ্যে তীব্রতা কিংবা ইন্দ্রিয়াবেগ, ব্যধিগ্রস্থতার প্রভাব ও ঘর্ম প্রবাহিত হওয়া শুরু হয়ে যায়।

১.

বিংশ অধ্যায়
একাকীত্ব ও নির্জনবাস

একাকীত্ব বা নির্জনতা দুই প্রকার। যথা–

১. জাহেরী নির্জনতা এবং ২. বাতিনী নির্জনতা।

১. জাহেরী নির্জনতা

জাহেরী বা প্রকাশ্য নির্জনতা হল, মানুষ প্রবৃত্তির তাড়না থেকে দূরে থাকার জন্য জনসাধারণের সাহচর্য থেকে দূরে থাকা যাতে লোকেরা তার কুপ্রভাব, মন্দ-আচরণ ও কষ্টদান থেকে নিরাপদ থাকে। আর নফসের জাহেরী ইন্দ্রিয়সমূহ বন্দী করে রাখা, যেন নিয়্যতের বিশুদ্ধতা, মৃত্যুর স্মরণ, কবরের জগতে প্রবেশ ইত্যাদির চিন্তা দ্বারা বাতিনী ইন্দ্রিয় উন্মুক্ত ও প্রসারিত হয়। নির্জনতার মধ্যে আল্লাহর সন্তুষ্টিই মূখ্য উদ্দেশ্য ও একমাত্র লক্ষ্য। এ ছাড়া ঈমানদারদেরকে কুপ্রবৃত্তির অনিষ্টতা থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্য থাকতে হবে। যেমন, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন–

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ ،

–সত্যিকার মুসলমান হল যার জিহ্বা ও হাত থেকে অপর মুসলমান নিরাপদ থাকবে।[১]

অর্থাৎ তার রসনা থেকে অশ্লীল ও অনর্থক বাক্য বের হবে না এবং তার হাত দ্বারা কেউ কষ্টের শিকার হবে না। তিনি আরো এরশাদ করেন–

سَلَامَةُ الْاِنْسَانِ مِنْ قِبَلِ اللِّسَانِ وَمُلَامَةُ الْاِنْسَانِ عَنْ قِبَلِ اللِّسَانِ وَكَفُّ عَيْنَيْهِ عَنِ الْخِيَانَةِ وَالنَّظْرُ اِلَى الْحَرَامِ وَكَذَا كَفُّ رِجْلَيْهِ وَاُذُنَيْهِ ،

–মানুষের নিরাপত্তা জিহ্বা দ্বারা হয়ে থাকে। আর তিরস্কারও জিহ্বার কারণে হয়ে থাকে। (অর্থাৎ রসনাই মানুষের মর্যাদা ও লাঞ্ছনার কারণ হয়ে থাকে)। অতএব আপন চক্ষুযুগলকে খেয়ানত ও অবৈধ বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত থেকে বিরত রাখবে। একইভাবে উভয় পা ও কানকে ভ্রান্তপথে অগ্রসর হওয়া ও মন্দকথাবার্তা শ্রবণ থেকে নিরাপদ রাখবে।

---

[১]. বোখারী : আস্‌ সহীহ, ১/১৫; মুসলিম : আস্‌ সহীহ, ১/১৪৯; তিরমিযী : আস্‌ সুনান, ৯/২১৪

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন–

اَلْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ ،

–চক্ষুদ্বয় ব্যভিচারে লিপ্ত হয়।[১]

আর এ ব্যভিচারের ফলশ্রুতিতে একজন কুৎসিত কৃষ্ণবর্ণ ভৃত্য মানবাকৃতিতে সৃষ্টি হয়, যে কিয়ামত দিবসে তার ব্যভিচারী পিতার সাথে দণ্ডায়মান হবে এবং আল্লাহর দরবারে তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। অতএব যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ এরূপ পাপ থেকে তাওবা করবে না এবং প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে আনবে না, জান্নাতকে তার আবাসস্থল রূপে পাবে না। মহামহিম রবের বাণী–

وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهَوَىٰ ۝ فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِىَ ٱلْمَأْوَىٰ ۝

–এবং যে স্বীয় প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে তার ঠিকানা জান্নাতই।[২]

তাওবার পর সৃষ্ট ঐ ভৃত্যকে অত্যন্ত সুন্দর ও লাবণ্যময় যুবকের আকৃতিতে পরিবর্তন করে দেয়া হবে। তখন ঐ সচ্চরিত্রবান ব্যক্তি জাহান্নামের কঠিন শাস্তি থেকে মুক্তি পাবে। নির্জনবাস গুণাহ থেকে মুক্ত থাকার নিরাপদ দূর্গ স্বরূপ। সেখানে ব্যক্তির সৎ-কার্যাবলীর ধারা স্থায়ী হবে এবং সে পুণ্যবানদের অধিভুক্ত হয়ে যাবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন–

فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَٰلِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ أَحَدًا ۝

–অতএব যে স্বীয় প্রতিপালকের সাক্ষাৎ প্রত্যাশী, তার উচিত সৎকর্ম করা ও তার রবের ইবাদতে কাউকে অংশীদার না করা।[৩]

বাতিনী নির্জনতা

বাতিনী বা অপ্রকাশ্য নির্জনতা হল যে, মানুষ তার অন্তরকে শয়তানের প্ররোচনামূলক চিন্তাধারা থেকে পবিত্র রাখা। অর্থাৎ পানাহার, উৎকৃষ্ট বস্ত্রাদি পরিধান, পরিবার-পরিজন, ধন-সম্পদ, মেষপাল, লাল রংয়ের ঘোড়া ইত্যাদির ভালবাসা থেকে অন্তরকে মুক্ত রাখা।

---

[১]. আহমদ :মসনদে আহমদ, ৮/২৫২; ইবনে হাব্বান : সহীহ, ১৮/৩৩৯
[২]. আল কুরআন : সূরা নাযিআত, ৭৯/৪০-৪১
[৩]. আল কুরআন : সূরা কাহ্‌ফ, ১৮/১১০

যেমন হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন–

اَلشُّهْرَةُ اٰفَةٌ وَكُلٌّ مَايَتَمَنَّاهَا وَالْخُمُوْلُ رَاحَةٌ وَكُلٌّ مَايَتَوَقَّاهَا ،

–যশ-খ্যাতি ও সেটার সারঞ্জামাদির অভিলাষ বিপদস্বরূপ। আর অখ্যাতি ও নির্জনতার আকাঙ্খাই প্রশান্তি।

নির্জনতা অবলম্বনকারীর জন্য আবশ্যক হল, যেন কুস্বভাবসমূহ যেমন 'অহংকার, ধোঁকা, হিংসা-বিদ্বেষ, কৃপণতা, পরনিন্দা চোগলখোরী, ক্রোধ ইত্যাদি তার অন্তরে প্রবেশ না করে।

যখন উক্ত দোষগুলো নির্জনতা অবলম্বনকারীর অন্তরে প্রবেশ করবে তখন তার নির্জনতা, তার অন্তর, তার সৎকর্ম ও পুণ্য সবকিছুই বিনষ্ট ও বিপর্যস্ত হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলার বাণী–

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿٨١﴾

–আল্লাহ তা'আলা অশান্তি সৃষ্টিকারীদের কর্ম সার্থক করেন না।[১]

যে ব্যক্তির অন্তরে এরূপ বিপর্যয় সৃষ্টিকারী বস্তু স্থান করে নেবে সে বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে, যদিও সে বাহ্যিকভাবে বড় সংস্কারক দাবী করুক।

হাদীস শরীফে রয়েছে–

اَلْكِبْرُ وَالْعُجْبُ يُفْسِدَانِ الْاِيْمَانَ ،

–অহংকার ও খোদ-পছন্দী ঈমানকে ধ্বংস করে দেয়।

[১]. আল কুরআন : সূরা ইউনুস, ১০/৮১;
(যেমন বর্তমানে ইসলাম বিদ্বেষীরা নিজদেরকে মানাবাধিকার রক্ষার ঝাণ্ডাবাহী বলে দাবী করে কিন্তু মজলুম ও অসহায় রাষ্ট্রের জনগোষ্ঠী যখন তাদের নায্য অধিকার আদায়ে জোরালো কণ্ঠে আওয়াজ তোলে তখন তাদেরকে নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী আখ্যা দিয়ে ধ্বংস করে দিতে তারা দ্রুত এগিয়ে আসে। যেমন আমেরিকা ও বৃটেনসহ সকল ইসলামদ্রোহী অপশক্তি আফগানিস্তান, ইরাক, ফিলিস্তিন ও চেচনিয়ায় বর্ণনাতীত নিষ্ঠুরতা, অত্যাচার ও বর্বরতার ষ্টীম রোলার চালিয়েছে। অন্যদিকে মুসলিম রাষ্ট্রের শাসকগণ নীরব ভূমিকায় তাদের অনুদানের ঝুলি ভর্তিতে সচেষ্ট হয়ে গোলামীর পরিচয় দিয়েছে। যা ইসলামের ইতিহাসে একটি ন্যাক্কারজনক ও লাঞ্ছনাদায়ক অধ্যায় সূচিত করেছে। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা যেন তিনি ইসলামী বিশ্বকে একজন দুর্বার ও সাহসী সিপাহসালার দান করেন, যিনি এসব বাতিল পরাশক্তির দূর্গে আঘাত হেনে ইসলাম ও মুসলমানদের শ্রেষ্ঠত্ব, মর্যাদা ও বিজয় শক্তিকে পুনরায় প্রতিষ্ঠা করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন। আমীন॥)

আরো এরশাদ করেন–

اَلْغِيْبَةُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا ،

–পরনিন্দা ব্যভিচারের চেয়েও নিকৃষ্ট।[১]

আরো ফরমান–

اَلْحَسَدُ يَأْكُلُ الْحَسنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبِ ،

–হিংসা পুণ্যসমূহকে তেমনি ধ্বংস করে দেয় যেমন আগুন কাঠকে ভক্ষণ করে।[২]

নবী করীম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো এরশাদ করেন–

اَلْفِتْنَةُ نَائِمَةٌ لَعَنَ اللهُ مَنْ اَيْقَظَهَا ،

–যে সুপ্ত ফিৎনাকে জাগ্রত করে আল্লাহ তা'আলা তার উপর অভিসম্পাত করেন।

আরো ফরমান–

اَلْبَخِيْلُ لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَوْ كَانَ عَابِدًا ،

–কৃপণ ব্যক্তি আবেদ হলেও জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন–

اَلرِّيَاءُ شِرْكٌ خَفِيٌّ وَشِرْكُهُ كُفْرٌ ،

–লৌকিকতা (রিয়া) গোপন শিরক। তার শিরক হচ্ছে কুফর।[৩]

কু-স্বভাব সম্বন্ধে অসংখ্য হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এখানে সতর্কতামূলক মাত্র কয়েকটি হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে। তরীকতের সিলসিলাসমূহ ও সূফীতত্ত্বে অন্তরকে কু-স্বভাব থেকে সংযত রাখা ও নফসকে কু-প্রবৃত্তির মোহ কামনা ও চাহিদা থেকে বাচিয়ে রাখাই প্রধান উদ্দেশ্য। অতএব যে ব্যক্তি নির্জনবাস, সংযম, নীরবতা ও পূর্ণ একাগ্রতা সহকারে সর্বদা যিক্‌র করে খোদাপ্রীতি, তাওবা, অকপটতা ও বিশুদ্ধ আকীদায় প্রতিষ্ঠিত থাকবে সে সাহাবায়ে কেরাম,

[১]. তাবরিযী : মিশকাত, পৃ. ৫৬; তাবরানী : মু'জামুল আওসাত, ১৪/৩৫৬
[২]. আবূ দাউস : আস্ সুনান, ১৩/৫৬; ইবনে মাযাহ : আস্ সুনান, ১২/২৫৩
[৩]. মোল্লা আলী কারী : মিরকাতুল মাফাতীহ, ১০/১৬২

যেমন হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন–

اَلشُّهْرَةُ اٰفَةٌ وَكُلٌّ مَايَتَمَنَّاهَا وَالْخُمُوْلُ رَاحَةٌ وَكُلٌّ مَايَتَوَقَّاهَا ،

–যশ-খ্যাতি ও সেটার সারঞ্জামাদির অভিলাষ বিপদস্বরূপ। আর অখ্যাতি ও নির্জনতার আকাঙ্খাই প্রশান্তি।

নির্জনতা অবলম্বনকারীর জন্য আবশ্যক হল, যেন কুস্বভাবসমূহ যেমন 'অহংকার, ধোঁকা, হিংসা-বিদ্বেষ, কৃপণতা, পরনিন্দা চোগলখোরী, ক্রোধ ইত্যাদি তার অন্তরে প্রবেশ না করে।

যখন উক্ত দোষগুলো নির্জনতা অবলম্বনকারীর অন্তরে প্রবেশ করবে তখন তার নির্জনতা, তার অন্তর, তার সৎকর্ম ও পুণ্য সবকিছুই বিনষ্ট ও বিপর্যস্ত হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলার বাণী–

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿٨١﴾

–আল্লাহ তা'আলা অশান্তি সৃষ্টিকারীদের কর্ম সার্থক করেন না।[১]

যে ব্যক্তির অন্তরে এরূপ বিপর্যয় সৃষ্টিকারী বস্তু স্থান করে নেবে সে বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে, যদিও সে বাহ্যিকভাবে বড় সংস্কারক দাবী করুক।

হাদীস শরীফে রয়েছে–

اَلْكِبْرُ وَالْعُجْبُ يُفْسِدَانِ الْاِيْمَانَ ،

–অহংকার ও খোদ-পছন্দী ঈমানকে ধ্বংস করে দেয়।

[১]. আল কুরআন : সূরা ইউনুস, ১০/৮১;
(যেমন বর্তমানে ইসলাম বিদ্বেষীরা নিজদেরকে মানাবাধিকার রক্ষার ঝাণ্ডাবাহী বলে দাবী করে কিন্তু মজলুম ও অসহায় রাষ্ট্রের জনগোষ্ঠী যখন তাদের নায্য অধিকার আদায়ে জোরালো কণ্ঠে আওয়াজ তোলে তখন তাদেরকে নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী আখ্যা দিয়ে ধ্বংস করে দিতে তারা দ্রুত এগিয়ে আসে। যেমন আমেরিকা ও বৃটেনসহ সকল ইসলামদ্রোহী অপশক্তি আফগানিস্তান, ইরাক, ফিলিস্তিন ও চেচনিয়ায় বর্ণনাতীত নিষ্ঠুরতা, অত্যাচার ও বর্বরতার ষ্টীম রোলার চালিয়েছে। অন্যদিকে মুসলিম রাষ্ট্রের শাসকগণ নীরব ভূমিকায় তাদের অনুদানের ঝুলি ভর্তিতে সচেষ্ট হয়ে গোলামীর পরিচয় দিয়েছে। যা ইসলামের ইতিহাসে একটি ন্যাক্কারজনক ও লাঞ্ছনাদায়ক অধ্যায় সূচিত করেছে। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা যেন তিনি ইসলামী বিশ্বকে একজন দুর্বার ও সাহসী সিপাহসালার দান করেন, যিনি এসব বাতিল পরাশক্তির দূর্গে আঘাত হেনে ইসলাম ও মুসলমানদের শ্রেষ্ঠত্ব, মর্যাদা ও বিজয় শক্তিকে পুনরায় প্রতিষ্ঠা করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন। আমীন॥)

আরো এরশাদ করেন–

اَلْغِيْبَةُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا ،

–পরনিন্দা ব্যভিচারের চেয়েও নিকৃষ্ট।[১]

আরো ফরমান–

اَلْحَسَدُ يَأْكُلُ الْحَسنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبِ ،

–হিংসা পুণ্যসমূহকে তেমনি ধ্বংস করে দেয় যেমন আগুন কাঠকে ভক্ষণ করে।[২]

নবী করীম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো এরশাদ করেন–

اَلْفِتْنَةُ نَائِمَةٌ لَعَنَ اللهُ مَنْ اَيْقَظَهَا ،

–যে সুপ্ত ফিৎনাকে জাগ্রত করে আল্লাহ তা'আলা তার উপর অভিসম্পাত করেন।

আরো ফরমান–

اَلْبَخِيْلُ لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَوْ كَانَ عَابِدًا ،

–কৃপণ ব্যক্তি আবেদ হলেও জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন–

اَلرِّيَاءُ شِرْكٌ خَفِيٌّ وَشِرْكُهُ كُفْرٌ ،

–লৌকিকতা (রিয়া) গোপন শিরক। তার শিরক হচ্ছে কুফর।[৩]

কু-স্বভাব সম্বন্ধে অসংখ্য হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এখানে সতর্কতামূলক মাত্র কয়েকটি হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে। তরীকতের সিলসিলাসমূহ ও সূফীতত্ত্বে অন্তরকে কু-স্বভাব থেকে সংযত রাখা ও নফসকে কু-প্রবৃত্তির মোহ কামনা ও চাহিদা থেকে বাচিয়ে রাখাই প্রধান উদ্দেশ্য। অতএব যে ব্যক্তি নির্জনবাস, সংযম, নীরবতা ও পূর্ণ একাগ্রতা সহকারে সর্বদা যিক্‌র করে খোদাপ্রীতি, তাওবা, অকপটতা ও বিশুদ্ধ আকীদায় প্রতিষ্ঠিত থাকবে সে সাহাবায়ে কেরাম,

[১]. তাবরিযী : মিশকাত, পৃ. ৫৬; তাবরানী : মু'জামুল আওসাত, ১৪/৩৫৬
[২]. আবূ দাউস : আস্‌ সুনান, ১৩/৫৬; ইবনে মাযাহ : আস্‌ সুনান, ১২/২৫৩
[৩]. মোল্লা আলী কারী : মিরকাতুল মাফাতীহ, ১০/১৬২

আউলিয়ায়ে ইযাম ও সৎকর্মশীলদের নির্দেশিত পথে উপনীত হবে। এ ছাড়া সে যদি সম্মানিত মাশায়েখ, সত্যিকার আলেম ও শরীয়তের পুরোধাদের অনুসরণের মাধ্যমে কু-প্রবৃত্তিকে চুর্ণ করে অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে নেয় এবং সৎমুমিনরূপে তাওবা- তালকীন (দীক্ষা) ও উল্লিখিত প্রশংসিত গুণাবলীসহকারে নির্জনতায় ব্যাপৃত হয়ে যায় তখন তার জ্ঞান ও আমল একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তোষ ও সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই বিশেষিত হয়ে যায়। তার কলব জ্যোতির্ময়, দেহ কোমল ও রসনা পবিত্র হয়ে যায়। তার জাহেরী ও বাতিনী ইন্দ্রিয় একাকার হয়ে যায় এবং তার সৎকর্ম আল্লাহর মহান দরবারে কবুলিয়তের মর্যাদায় ভূষিত হয়। তার দোয়া গৃহীত হয়। তার ইবাদত, সাধনা, গুণগান, প্রার্থনা ও রোদন কবুল হয়। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাকে নৈকট্য ও কবুলিয়তের সনদ দান করেন। তার পদমর্যাদা বৃদ্ধি পেতে থাকে। যেমন আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন—

إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّٰلِحُ يَرْفَعُهُۥ ۞

—পবিত্র বাণীসমূহ তার নিকট পৌঁছে থাকে (অর্থাৎ তাঁর দরবারে কবুল হয়ে থাকে) এবং সৎকর্ম পুণ্যবানদের পদমর্যাদা বৃদ্ধির মাধ্যম হয়।[১]

পবিত্র বাণীসমূহ দ্বারা উদ্দেশ্য হল যখন জিহ্বা আল্লাহ তা'আলার যিক্‌র ও তাঁর একত্ববাদ প্রকাশের যন্ত্র হয়ে যায় তখন মানুষের উচিত যাবতীয় অযথা ও অনর্থক কথাবার্তা থেকে রসনাকে সংযত রাখা।

আল্লাহ তা'আলার বাণী—

قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ فِى صَلَاتِهِمْ خَٰشِعُونَ ۞

وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۞

—নিশ্চয় ঐসব ঈমানদার সফলকাম হয়েছে যারা আপন নামাযসমূহ একাগ্রতা ও মনোসংযতি সহকারে আদায় করেছে। এবং যারা অযথা কথাবার্তা থেকে বিরত থাকে ।[২]

[১]. আল কুরআন : সূরা ফাতির, ৩৫/১০
[২]. আল কুরআন : সূরা মু'মিনুন, ২৩/১-৩

এরূপ ঈমানদারের ইলম ও আমলকে আল্লাহ তা'আলা কবুলিয়তের মর্যাদা দান করেন এবং এর উপর আমলকারীকে তাঁর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি দ্বারা বিশেষ অনুগ্রহ, নৈকট্য ও সুউচ্চ পদমর্যাদায় ভূষিত করেন। যখন নির্জনবাসকারীর এ পদমর্যাদা অর্জিত হয়ে যায় তখন তার অন্তঃকরণ উদারতার মহা সমুদ্রে পরিণত হয়। অতঃপর সে লোকদের অত্যাচার ও উৎপীড়ন অনুভবও করে না। যেমন হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন— كُنْ بَحْرًا لَاتَتَغَيَّرْ—হে লোক সকল! তোমরা সমুদ্রের ন্যায় (উদার) হয়ে যাও, তোমাকে কেউ পরিবর্তন করতে পারবে না। কু-প্রবৃত্তির বনভূমি ও মরুপ্রান্তর তাতে বিলীন হয়ে যাবে। যেভাবে ফিরআউন ও তার সঙ্গীরা নীল নদে একত্রে ডুবে মরেছে।

তখন শরীয়তের তরী অন্তরে নির্বিঘ্নে ও নিরাপদে চলতে থাকবে। অতঃপর রূহে-কুদসী ঐ সমুদ্রে ডুব দিয়ে হাকীকতের দরিয়ায় পৌঁছে যাবে এবং মারিফাতের মোতি, মণি-মাণিক্য ও সূক্ষ্ম-জ্ঞানের (لطائف) জাবাররুদ তুলে আনে। যেমন, আল্লাহ তা'আলার বাণী—

يَخْرُجُ مِنْهُمَا ٱللُّؤْلُؤُ وَٱلْمَرْجَانُ ۞

—ঐ সমুদ্রদ্বয় থেকে মোতি ও মারজান বের হবে।[১]

ঐ সমুদ্রের অধিকারী তো ঐ ব্যক্তিই হতে পারবে যে ঐ জাহের ও বাতেনের সমুদ্রদ্বয়কে (শরীয়ত ও হাকীকতের সমুদ্র) মিলিত ও একত্রিত করতে পারবে। এটা অর্জনের পর কলবের সমুদ্রে কোন প্রকার কুপ্রবৃত্তির বিপর্যয়ের প্লাবন আঘাত হানার আশঙ্কা থাকবে না। তার তাওবা খাঁটি, তার ইলম উপকারী এবং আমল সৎ ও পবিত্র হবে। সে পুনরায় নিষিদ্ধ কর্মে অগ্রসর হবে না। অর্থাৎ খোদা না করুক যদি কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি সংঘটিত হয়েও যায় তাবে দ্রুত তাওবা, ইস্তিগফার ও অনুতপ্ত হওয়ার মাধ্যমে পবিত্র করে দেয়া হবে। অর্থাৎ তার তাওবা কবুল হয়ে যাবে।

[১]. আল কুরআন : সূরা আর রহমান, ৫৫/২২

একবিংশ অধ্যায়

নির্জনতার ওযীফাসমূহ

اوراد (আওরাদ) শব্দটি ورد (ওরদুন) এর বহুবচন। এর দ্বারা ওযীফা, যিক্‌র-আযকার, দরূদ-সালাম, তাওবা-ইস্তিগফারের বাক্য, প্রশংসাজ্ঞাপক বাণী এবং মুনাজাত ও প্রার্থনা উদ্দেশ্য।

নির্জনতা অবলম্বনকারীর জন্য আবশ্যক হল ঐ সময় নির্জনবাস করা যখন সে সক্ষম হয়। সেখানে রোযা পালন করবে, পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাত সহকারে আদায় করবে, নামাযের সুন্নাত শর্ত ও রুকনসমূহ আদায়ের মাধ্যমে উত্তমপন্থায় নামায আদায় করবে। তাদীলে আরকান ধীরস্থিরভাবে অত্যন্ত একাগ্র ও নিবিষ্টচিত্তে আদায় করবে। তাহাজ্জুদের সময় (অর্ধ রাত্রির পর) দু'রাকাত করে বার রাকাত তাহাজ্জুদ'র নামায আদায় করবে। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন–

صَلٰوةُ اللَّيْلِ مَثْنٰي مَثْنٰي وَبَعْدَهَا تُصَلِّيْ ثَلَاثَ رَكْعَاتٍ صَلٰوةَ الْوِتْرِ ،

–তাহাজ্জুদের নামায দুই-দুই রাকাত করে আদায় করবে। অতঃপর তিন রাকাত বিতরের নামায পড়বে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِۦ نَافِلَةً لَّكَ ﴿٧٩﴾

আর রাতে তাহাজ্জুদ আদায় করুন, এটা বিশেষভাবে আপনার জন্যই।[১]

আরো এরশাদ করেন–

تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ ﴿١٦﴾

–তাদের পার্শ্বদেশ বিছানাসমূহ থেকে পৃথক থাকে।[২]

---

১. আল কুরআন : সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭/৭৯
২. আল কুরআন : সূরা আস্ সিজদা, ৩২/১৬

সূর্যোদয়ের পর ইশরাকের নামায পড়বে। অতঃপর শয়তানের অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনার মানসে আরো দুই রাকাত সালাতুল ইস্তিগফার আদায় করবে। আর তাতে প্রথম রাকাতে সূরা ফাতেহার পর সূরা ফালাক ও দ্বিতীয় রাকাতে সূরা নাস পাঠ করবে। এরপর দু'রাকাত ইস্তিখারার (মঙ্গল অবগতির) নামায আদায় করবে। তাতে প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতেহার পর একবার আয়াতুল কুরসী ও সাতবার সূরা ইখলাস পাঠ করবে। অতঃপর (সূর্য ঢলে পড়ার পূর্বে) ছয় রাকাত চাশতের নামায আদায় করবে, তাতে সূরা ফাতেহার পর যে কোন একটি সূরা পাঠ করবে। এরপর দু'রাকাত কাফ্‌ফারার নামায আদায় করবে, তাতে প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সাতবার সূরা কাউসার শরীফ তিলাওয়াত করবে। এ নামায প্রস্রাবের কাফ্‌ফারা ও কবরের শাস্তি থেকে মুক্তির মাধ্যম হয়ে যাবে।[১]

নবী করীম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন–

اِسْتَنْزِهُوْا عَنِ الْبَوْلِ فَاِنَّ عَامَةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ ،

–প্রস্রাব থেকে বেঁচে থাক। কারণ, সাধারণত এ কারণেই কবরের শাস্তি হয়ে থাকে।

---

১. [এ প্রসঙ্গে হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা হতে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে। তিনি বলেন–

قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ الْبَوْلِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ فَغَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً قَالُوا يَا رَسُولَ اللّٰهِ لِمَ فَعَلْتَ هٰذَا قَالَ لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا ،

–একদিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'টি কবরের পাশ দিয়ে গমন করলেন। আর বললেন, তাদের উভয়ের উপর শাস্তি হচ্ছে এবং তা কোন বড় গুণাহের কারণে হচ্ছে না। তাদের মধ্যে একজন চোগলখোর ছিল অপরজন প্রস্রাব থেকে পবিত্রতা অর্জনে সতর্কতা অবলম্বন করত না। (বর্ণনাকারী বলেন,) অতঃপর তিনি একটি তাজা সবুজ ডাল নিয়ে সেটাকে দু'টুকরো করে তাদের উভয়ের কবরের উপর গেড়ে দিলেন। এরপর বললেন, যতক্ষণ পর্যন্ত এটি শুষ্ক হবে না আশা করা যায় যে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের শাস্তি শিথিল থাকবে। (বোখারী, ১/১৮)

হুযুর সায়্যিদুনা গাউসে আযম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যে কাফ্‌ফারার নামাযের কথা বর্ণনা করেছেন তা এরূপ ইচ্ছাকৃত কিংবা অনিচ্ছাকৃত অসতর্কতার কাফ্‌ফারার জন্যই। তাই এটাকে তিনি كفارة البول বা প্রস্রাবের কাফ্‌ফারার নামায নামে নামকরণ করেছেন। অর্থাৎ কোন না কোন সময় মানুষ প্রস্রাবের প্রাক্কালে ছিটকার সম্মুখীন হয়ে শাস্তির উপযুক্ত হয়ে যেতে পারে। তাই ঐ শাস্তি থেকে পরিত্রাণের লক্ষ্যে এটি একটি উপায় যে, চাশত কিংবা দোহার নামাযের পর কাফ্‌ফারাতুল বাউল-এর নামায আদায় করা। তবে আশা করা যায় যে, আল্লাহ তাআলা এ নামাযের বদৌলতে কবরের শাস্তি থেকে নিস্কৃতি দান করবেন।]

অতঃপর চার রাকাত নামায আদায় করবে। আর যদি দিনের বেলায় হয় তাহলে হানাফী মাযহাবাবলম্বী হলে চার রাকাত এক সালামে আর শাফি'ঈ মাযহাবাবলম্বী হলে দু'রাকাত পর সালাম ফেরানোর মাধ্যমে আদায় করবে। রাত্রি বেলায় যেভাবে সুবিধা সেভাবে আদায় করবে। অর্থাৎ চার রাকাত পর সালাম ফেরানো ও দু'রাকাত পর সালাম ফেরানো উভয়টি বৈধ। এটাকে সালাতুত তাসবীহও বলা হয়।

হুযূর সায়্যিদুনা গাউসে পাক রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু তাসবীহ'র নামায প্রসঙ্গে বলেন, নির্জনবাসকারী এভাবে নিয়্যত করবে যে, আমি আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যে চার রাকাত 'সালাতুত তাসবীহ' এর নিয়্যত করলাম। অতঃপর তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় এ দোয়া পাঠ করবে–

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا ۖ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿٧٩﴾ [1]

এরপর সানা পাঠ করে পনের বার–

سُبْحَانَ اللهِ وَالحَمْدُ للهِ وَلاَاِلَهَ اِلاَّاللهُ وَاللهُ اَكْبَرْ ،وَلاَحَوْلَ وَلاَقُوَّةَ اَلاَّ بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ،

পাঠ করবে। অতঃপর আলহামদু শরীফ এবং এর সাথে কোন সূরা কিংবা আয়াত। যেমন, সূরা বাকারা শরীফের শেষোক্ত আয়াতসমূহ অথবা যে-কোন সহজ আয়াত তিলাওযাতের পর দশবার উপরিউক্ত বাক্যমালা পাঠের পর রুকু করবে। তিনবার রুকুর তাসবীহ পাঠ করে দশবার উক্ত তাসবীহমালা পাঠ করবে। এরপর রুকু থেকে দাঁড়িয়ে দশবার একই তাসবীহ পাঠ করে সিজদায় যাবে। সিজদার তাসবীহ তিনবার পাঠের পর উক্ত তাসবীহ পুনরায় দশবার পড়বে। এরপর দ্বিতীয় সিজদাতে উক্ত তাসবীহমালা দশবার ও সিজদা শেষে উপবিষ্ট হয়ে দশবার পাঠ করবে। অতঃপর দ্বিতীয় রাকাতে দাঁড়িয়ে যাবে এবং বর্ণিত নিয়মে ধারাবাহিকভাবে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাত পূর্ণ করবে। স্মর্তব্য যে, দ্বিতীয় রাকাতের পর তাশাহুদ, দরূদ শরীফ ও দোয়ায়ে মাসূরা

[1]. আল কুরআন : সূরা আন'আম : ৬/৭৯

সহকারে পাঠ করবে। এভাবে প্রত্যেক রাকাতে পচাত্তর বার করে মোট তাসবীহ তিনশত বার হবে।[1]

শাফিয়ীগণ এভাবে নিয়্যত করবে যে, আমি দু'রাকাত তাসবীহর নামাযের নিয়্যত করছি নিরেট আল্লাহর উদ্দেশ্যে। অতঃপর তাকবীরে তাহরীমা বলে সূরা ফাতিহা ও অন্য কোন সূরা পাঠের পর পনেরবার উক্ত তাসবীহ পাঠ করবে। অতঃপর রুকুতে দশবার, রুকু থেকে দাঁড়িয়ে দশবার, প্রথম সিজদায় দশবার, সিজদা থেকে উঠার পর দশবার, দ্বিতীয় সিজদায় দশবার ও সিজদা থেকে উঠার পর দশবার উক্ত তাসবীহমালা পাঠ করবে। এভাবে আত্তাহিয়্যাতু ইত্যাদি পাঠের মাধ্যমে দু'রাকাত পূর্ণ করবে।

নির্জনবাসকারী ব্যক্তি দৈনিক একবার তাসবীহ'র নামায আদায় করবে। আর যদি প্রতিদিন আদায় করতে না পারে তবে প্রতিসপ্তাহে একবার, সপ্তাহে না পারলে প্রতিমাসে একবার, প্রতিমাসে একবার আদায়ে অক্ষম হলে প্রতিবছর একবার এবং প্রতিবছরে এক বার আদায়েও অপারগ হলে কমপক্ষে সারাজীবনে একবার অবশ্যই আদায় করবে। সায়্যিদে আলম হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চাচা হযরত আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমাকে বলেন, 'যে ইমানদার ব্যক্তি তাসবীহ'র নামায পড়বে আল্লাহ তা'আলা তার সমস্ত পাপ মার্জনা করে দেবেন। যদিও তার পাপরাশি বালুকণা, আকাশের নক্ষত্র ও ভূ-পৃষ্ঠের সব বস্তুর সংখ্যা অপেক্ষাও অধিক হয়।'

তরীকতপন্থীদের জন্য আবশ্যক হল যে, তারা প্রত্যেহ দোয়ায়ে সাইফী ও কুরআন মজীদের নূন্যতম দু'শত আয়াত তিলাওয়াত করবে। অতঃপর অধিকহারে যিক্‌র করবে। যদি প্রকাশ্য যিক্‌র করতে পারে তবে প্রকাশ্য যিক্‌র করবে। আর অপ্রকাশ্য যিক্‌রের যোগ্যতা হাসিল হলে গোপন যিক্‌রে তন্ময় থাকবে। গোপন যিক্‌রের স্থান হল ক্বলব। আর তা 'লতীফায়ে সির' জিহ্বা দ্বারা করা হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন– وَاذْكُرُوْا كَمَا هَدَٰكُمْ –তোমরা ঐভাবে যিক্‌র কর যেভাবে তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন।

[1]. [অনেক আলেম প্রথম সিজদার পর বৈঠকে দশ বার তাসবীহ পাঠ করে দ্বিতীয় সিজদায় যাওয়ার কথাও বলেছেন। এরূপ হলে দ্বিতীয় সিজদার পর তাসবীহ পাঠ করতে হবে না। এটা সহজ নিয়ম এবং তাতে ভুলের সম্ভাবনাও কম। আরো বলেছেন, এ নামাযের তাসবীহ হল– سُبْحَانَ اللهِ وَالحَمْدُ للهِ وَلاَاِلَهَ اِلاَّاللهُ وَاللهُ اَكْبَرْ]

অর্থাৎ যিক্‌রের স্তরসমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখ যে, যিক্‌রের প্রতিটি পর্যায়ের বিশেষ আদব রয়েছে, যা ঐ স্তরের উপযুক্ত ব্যক্তিই অবগত।

প্রতিদিন একশবার সূরা ইখলাস পাঠ ও একশবার হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমীপে দরূদ ও সালাম পেশ করবে। অতঃপর একশতবার এ ওযীফা পাঠ করবে–

اَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيْمَ الَّذِيْ لَاۤاِلَهَ اِلاَّهُوَ الحَيُّ الْقَيُّوْمُ مِمَّا قَدَّمْتَ وَمَااَخَّرْتَ وَمَااَعْلَنَتَ وَمَااَسْرَرْتَ وَمَااَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ اَنْتَ الْمُقَدَّمُ وَاَنْتَ الْمُوَخَّرُ وَاَنْتَ عَلي كُلِّ شَئْيٍ قَدِيْرٌ،

এছাড়াও যদি নফল নামায, কুরআন তিলাওয়াত দরূদ-সালাম ও ওযীফা পাঠের সামর্থ্য ও সুযোগ লাভ হয় তবে তা অবশ্যই করতে থাকবে।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

তন্দ্রা ও স্বপ্নের বর্ণনা

স্বপ্ন ও তন্দ্রায় দৃষ্ট ঘটনাবলীর কতেক বিবেচনাযোগ্য, সত্য ও ফলদায়ক। যেমন আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন–

لَّقَدْ صَدَقَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّءْيَا بِٱلْحَقِّ ۖ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ﴿٢٧﴾

–নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা আপন রাসূলের স্বপ্নকে সত্য করে দেখিয়েছেন যে, নিশ্চয় তিনি অবশ্যই নিরাপদে মসজিদে হারামে (বায়তুল্লায়) প্রবেশ করবেন।[১]

এছাড়া হযরত সায়্যিদুনা ইউসুফ আলাইহিস সালামের ভাষ্য কুরআন মজীদে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে–

إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَٰجِدِينَ ﴿٤﴾

–(স্বপ্নে) এগারটি তারকা, সূর্য ও চন্দ্র আমাকে সিজদা করতে দেখলাম।[২]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন–

لَمْ يَبْقَ مِنْ بَعْدِيْ نُبُوَّةٌ اِلاَّ الْمُبَشِّرَاتِ يَرَاهَا الْمُؤْمِنُ اَوْ تُرِي لَهُ،

–আমার পর কোন নবুয়ত থাকবে না। তবে সু-সংবাদ প্রদানকারী সত্য স্বপ্ন অবশিষ্ট থাকবে, যা ঈমানদার ব্যক্তি দেখবে কিংবা তাকে দেখানো হবে।

১. আল কুরআন : সূরা ফাতহ, ৪৮/২৭
২. আল কুরআন : সূরা ইউসুফ, ১২/৪

উক্ত হাদীসের প্রমাণ আল্লাহর এ বাণী–

لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ ﴿٦٤﴾

–এসব ওলীর জন্য ইহকাল ও পরকালে সুসংবাদ রয়েছে।

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন–

مَنْ رَاٰنِيْ فَقَدْ رَاٰنِيْ حَقًّا فَاِنَّ الشَّيْطَانَ لَايَتَمَثَّلُ بِيْ ،

–যে আমাকে স্বপ্নে দেখেছে নিশ্চয় সে আমাকেই দেখেছে। কারণ, শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না।[১]

অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি শরীয়ত, তরীকত ও মারিফাতের নূর এবং হাকীকতের জ্যোতি দ্বারা আমাকে অনুসরণ করেছে তার আকৃতিও শয়তান ধারণ করতে পারে না।

যেমন কুরআন করীমে রয়েছে–

أَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا۠ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِى ﴿١٠٨﴾

–আমি আল্লাহ তা'আলার পথে আহ্বান করছি সজ্ঞানে এবং আমার অনুসারীরাও।[২]

শয়তান ঐ জ্যোতির বিকিরণের কারণে নূরের রূপ পরিগ্রহ করতে পারে না। 'মাযহার' গ্রন্থের প্রণেতা বর্ণনা করেছেন যে, শয়তান হুযুর করীম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়াও এমন সব কিছুর আকৃতি ধারণেও অক্ষম যা আল্লাহর অনুগ্রহ, অনুকম্পা, দয়া ও হেদায়তের প্রকাশস্থল। যেমন- সমস্ত নবী ও রাসূল, ওলী, ফেরেশতা, কা'বা শরীফ, সূর্য, চন্দ্র, শুভ্র মেঘ, কুরআন করীম ইত্যাদি। কারণ, শয়তান আল্লাহর ক্রোধ ও গযবের প্রকাশস্থল, তাই তার থেকে গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতার গুণাবলীই প্রকাশ পেতে থাকে। আর যেসব গুণ সৎপথ ও হেদায়তের প্রকাশস্থল সেগুলো ভ্রান্ত ও ভ্রষ্টতার সাথে কিভাবে সম্পৃক্ত হতে পারে। কারণ, হেদায়ত ও গোমরাহী তো আগুন ও পানির ন্যায় বিপরীতধর্মী, এ দু'টির সংমিশ্রণ অসম্ভব। কারণ, এতদুভয়ের

[১]. আহমদ : মসনদে আহমদ, ২৩/১৪১
[২]. আল কুরআন : সূরা ইউসুফ, ১২/১০৮

মধ্যে বিরাট পার্থক্য ও বৈপরিত্য বিদ্যমান। সত্য-মিথ্যার পার্থক্য প্রসঙ্গে আল্লাহর বাণী–

كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَٰلَهُمْ ﴿٣﴾

–এভাবেই আল্লাহ তা'আলা (সত্য ও মিথ্যার ক্ষেত্রে) তাদের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেন।[১]

শয়তান মানুষের অন্তরে এ বলে কুমন্ত্রণা দিতে পারে যে, এটা আল্লাহর রূপ। সে প্রভুত্বও দাবী করতে পারে। শয়তান মহত্ত্বের (جلالي) রূপে নিজকে প্রকাশ করতে পারে। কারণ, সে আল্লাহর ক্রোধের (قهر) গুণের বিকাশস্থল। এ রূপে সে খোদায়ী দাবী করতে পারে। কারণ, সে গোমরাহীর গুণের প্রকাশস্থল। সে মহত্ত্বের রূপে নিজের ভ্রান্তির সত্যতা প্রকাশ করে, যেভাবে বর্ণিত হয়েছে। কারণ, তার মধ্যে হেদায়তের গুণ পাওয়া যায় না। এ প্রসঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার অবকাশ রয়েছে এবং এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের জন্য অনেক দফতর প্রয়োজন। আল্লাহ তা'আলার বাণী– عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا۠ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِى –[আমি ও আমার অনুসরীরা দূরদৃষ্টিসম্পন্ন।[২]] তে মুর্শিদে কামিলের উত্তরাধিকারীদের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে, যারা দিক-নির্দেশনা প্রদানে সক্ষম হয়। আর রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমান, "আমার অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা তাদের বাতিনী দৃষ্টি লাভ হবে"-এর দ্বারা কামিল বা পরিপূর্ণ বিলায়ত উদ্দেশ্য। যেটার প্রতি আল্লাহ তা'আলার এ বাণী ইঙ্গিতবহ, وَلِيًّا مُّرْشِدًا। –অভিভাবক, পথপ্রদর্শক।[৩] অতএব জেনে নেয়া উচিত যে, স্বপ্ন দুই প্রকার। যথা-১. افاقي। সজাগস্বপ্ন এবং ২. نفسي আত্মার স্বপ্ন।

আত্মার স্বপ্ন

এমন স্বপ্ন যা সৎস্বভাব কিংবা অসৎকর্ম থেকে সৃষ্ট। যে সব স্বপ্ন সু-স্বভাবের হতে সৃষ্ট সেটার ধরণ হল স্বপ্নে জান্নাত ও জান্নাতের নেয়ামতরাজি প্রাপ্ত হওয়া। অর্থাৎ হুর, গিলমান জ্যোতির্ময় ও শুভ্রপ্রান্তর, চন্দ্র-সূর্য, তারাকারাজি ও তৎসংশ্লিষ্ট বস্তুসমূহ দেখা। এগুলোর সম্বন্ধ আত্মার গুণাবলীর সাথে।

[১]. আল কুরআন : সূরা মুহাম্মদ, ৪৭/৩
[২]. আল কুরআন : সূরা ইউসুফ, ১২/১০৮
[৩]. আল কুরআন : সূরা কাহাফ, ১৮/১৭

স্বপ্নে চতুষ্পদ প্রাণী ও পাখির মাংস ভক্ষণ করতে দেখা গেলে তা নফসে মুতমাইন্নার সাথে সম্পৃক্ত হয়। কারণ, জান্নাতীদের আহার্য এরূপই হবে। অর্থাৎ ছাগলের ভুনা মাংস ও পাখির কাবাব ইত্যাদি। গাভী দেখলে মনে করতে হবে যে, এটা হযরত আদম আলাইহিস সালামকে ক্ষেত খামার করার উদ্দেশ্যে জান্নাত থেকে অবতারণ করা হয়েছিল। উট, জাহেরী ও বাতিনী কা'বার সৌন্দর্যের জন্য জান্নাত থেকে এসেছে। আর ঘোড়া বড় ও ছোট জিহাদের জন্য প্রেরিত হয়েছে। আর এসব কিছুই পরকালের সাফল্যের জন্য। হাদীস শরীফে রয়েছে–

إِنَّ الْغَنَمَ خُلِقَ مِّنْ عَسَلِ الْجَنَّةِ،

নিশ্চয় ছাগল জান্নাতের মধু, গরু জাফরান, উট প্রস্ফুটিত পাপড়ি ও ঘোড়া জান্নাতের সুগন্ধিযুক্ত ফুল থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর খচ্চর নফসে মুতমায়িন্নার সাধারণ সিফাত থেকে। যদি কেউ খচ্চর স্বপ্নে দেখে তবে সেটার ব্যাখ্যা হবে যে, সে ব্যক্তি ইবাদতে উদাসীন, তার উপর প্রবৃত্তির কু-প্রভাব প্রবল এবং তার আমল উপকার শূন্য ও অর্থহীন। তবে তাওবা করলে তাকে উত্তম বিনিময় দান করা হবে। গাধা জান্নাতের পাথরসমূহ থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। যেন সেটা হযরত আদম আলাইহিস সালাম ও তার সন্তানদের সেবা করতে পারে। যখন রূহ বা আত্মা পাপ ও অন্যায় কাজ থেকে নিভৃত হয়ে আল্লাহর পথে অগ্রসর হবে তখন তার উপর আল্লাহর জ্যোতির বারিধারা বর্ষিত হবে। আর তা শত্রুহীন সুদর্শন যুবকের আত্মার সাথে সম্বোধিত হয়ে তার সাথে বাক্যালাপ করবে। কারণ, সকল জান্নাতবাসীই এরূপ সুন্দর রূপপরিগ্রহ করবে। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন–

أَهْلُ الْجَنَّةِ جُرْدٌ مُرْدٌ كُحْلٌ،

–জান্নাতবাসী লোমহীন যৌবন ও কুদরতী সুরমা লাগানো অবস্থায় থাকবে।[১]

[১]. তিরমিযী : আস্ সুনান, ৯/৮৭; তাবরিযী : মিশকাত, পৃ. ২২৫

আরো এরশাদ করেন–

رَأَيْتُ رَبِّيْ عَلٰي صُوْرَةِ شَابٍّ اَمْرَدٍ،

–আমি আমার রবকে অত্যন্ত সুন্দর লোমশূন্য যুবকের আকৃতিতে দেখেছি।[১]

কতিপয় আলেম বলেন– "আল্লাহ তা'আলা আপন রবুবিয়্যাতের গুণে প্রকাশ পাওয়া মানে দর্পণে তাঁর তাজাল্লী বা জ্যোতি বিচ্ছুরণ। আর এটাকে তিফলুল মা'আনী নামে নামকরণ করা হয়। পীর বা মুর্শিদের অস্তিত্ব দর্পণ এবং আল্লাহ ও মুরীদের মধ্যে ওসীলা ও মধ্যস্থতা স্বরূপ।"

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন–

لَوْلَا تَرْبِيَةُ رَبِّيْ لَمَا عَرَفْتُ رَبِّيْ،

–যদি আমার রব আমাকে দীক্ষিত না করতেন তাহলে আমি আমার রবের পরিচয় লাভ করতে পারতাম না।

ঐ বাতিনী মুর্শিদ লাভের মধ্যম হল জাহেরী পীরের দীক্ষা ও পথ নির্দেশনা গ্রহণ করা, যা সম্মানিত নবী রাসূল, ওলী ও আলেমদের সংস্পর্শ ব্যতীত সম্ভব নয়। ঐ তরবীয়তের ফলে অন্য রূহের সাক্ষাতের মাধ্যমে আত্মা জ্যোতির্ময় ও আলোকিত হয়ে যায়। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী–

يُلْقِي ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِۦ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ ﴿١٥﴾

–আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তার নির্দেশে রূহ (ওহী বা ইলহাম) প্রেরণ করেন।[২]

এরূপ রূহ লাভের জন্য কামিল মুর্শিদের সন্ধান করা অত্যাবশ্যক। অতএব এটি উত্তমরূপে বোধগম্য হওয়া উচিত। হযরত ইমাম গাযযালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন– "উল্লেখিত ব্যাখ্যার আলোকে আল্লাহ তা'আলাকে স্বপ্নে পারলৌকিক সৌন্দর্যের রূপে দেখা বৈধ। কারণ, পীর ও মুর্শিদ তো একজন অনুসরণীয় দৃষ্টান্তই হয়ে থাকে। যা (দৃষ্টান্ত) আল্লাহ তা'আলা স্বপ্নে অবলোকনকারীর যোগ্যতা ও উপযুক্ততার সাথে ভারসাম্যপূর্ণ করে প্রকাশ

[১]. কাশফুল খুফায়া, ১/৪৩৬
[২]. আল কুরআন : সূরা গাফির, ৪০/১৫

করেন। তবে তা আল্লাহ তা'আলার প্রকৃত সত্তার স্বপ্ন হয় না। কারণ, ঐ মহিমাময় সত্তা আকার ও আকৃতি থেকে পূতঃপবিত্র।"

একইভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূরানী সত্তা তো ঐ ব্যক্তিই দেখতে পারে যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইলম, আমল, হাল-অবস্থা অন্তর্দৃষ্টি ও নামায ইত্যাদি প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সবকিছুর যোগ্য উত্তরাধিকারী হয়।

মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যায় রয়েছে, উপরিউক্ত ভাষ্য অনুযায়ী মানবীয় ও নূরের আকৃতিতে আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভ বৈধ। একইভাবে তাঁর প্রত্যেক গুণাবলীর জোতি দর্শনের ব্যাপারেও সমবিধান প্রযোজ্য। যেভাবে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম তুর পর্বতে আঙ্গুর বৃক্ষে আগুণের আকৃতিতে আল্লাহ তা'আলার জ্যোতি দর্শন করেছিলেন। আর আল্লাহ তা'আলার সিফাতী বাক্য, যা হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে বলেছিলেন, তা হচ্ছে–

وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَٰمُوسَىٰ ﴿١٧﴾

–হে মূসা! তোমার ডান হাতে কী?[১]

এ আগুন প্রকৃতপক্ষে নূরই ছিল। সুতরাং হযরত মূসা আলাইহিস সালামের দর্শন ও ধারণা এটাকে আগুন বলে অবিহিত করেছে। কারণ, হযরত মূসা আলাইহিস সালাম তখন আগুনের সন্ধানে ব্যাপক প্রচেষ্টায় ছিলেন (কিন্তু ঐ বৃক্ষ তো আগুন ছিল না)। মানবজাতি ঐ বৃক্ষের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। তাই এটা নিশ্চয় বিস্ময়ের বিষয় নয় যে, যদি মানুষ অভ্যন্তরীণ পরিশুদ্ধির (تزكية باطن)পর পাশবিকতার গুণাবলী বর্জন করে মনুষ্যত্বের চরিত্রাবলি পরিপূর্ণভাবে অর্জন করে, এরপর আল্লাহ তা'আলা আপন কৃপায় তার এ সত্যিকার মানুষের রূপে স্বীয় গুণাবলীসমূহের কোন একটি গুণের তাজাল্লী ও জ্যোতির বহিঃপ্রকাশ ঘটাবেন। যেমন অসংখ্য আউলিয়ায়ে কেরাম এরূপ জ্যোতির সৌভাগ্য লাভে ধন্য হয়েছেন। হযরত বায়েযীদ বোস্তামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আল্লাহর বিশেষ জ্যোতি প্রকাশের সময় বলেছিলেন–

سُبْحَانِيْ مَا اَعْظَمَ شَانِيْ ،

–আমার সত্তার পবিত্রতা যে, আমার মর্যাদা কতই সুউচ্চ।

---

[১]. আল কুরআন : সূরা ত্বহা, ২০/১৭

হযরত সায়্যিদুনা জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন–

لَيْسَ فِيْ جُبَّتِيْ سَوَي اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالِي ،

–আমার জুব্বায় আল্লাহর সত্তা ব্যতীত অন্য কিছু নেই।

এরূপ আরো অসংখ্য দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

এ স্তরটি তাসাউফপন্থীদের জন্য অতি নিগুঢ় ও রহস্যময়। যেটার বিবরণ অতিদীর্ঘ। মারিফাত শিক্ষার মধ্যে এগুলো সম্পর্কে সম্যক ধারণা অত্যন্ত জরুরী। কারণ, যে ঐ পথে প্রাথমিক অবস্থায় আছে এবং যে আল্লাহর গুণাবলীর সাথে পারস্পরিক সম্বন্ধ রাখেনা এবং রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথেও আন্তরিক হৃদ্যতা নেই, তার জন্য অত্যাবশ্যক হল কামিল পীরের বিশেষ দীক্ষা লাভ ও নির্দেশনা পালন করা। কারণ, পীর ও মুরীদের মধ্যে মানবীয় সম্বন্ধ বিদ্যমান রয়েছে। যেমন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐসম্বন্ধের বৈষম্য দূর ও সমতা বিধানের জন্য মানবীয় পোশাকে আত্মপ্রকাশ করেছেন। সরকারে দো'আলম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামের জাহেরী জীবদ্দশায় তাঁর নির্দেশনা ব্যতীত অন্য কারো দীক্ষা ও পথ নির্দেশনার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু তাঁর বেসালের পর যখন তাঁর প্রকাশ্য (জাহেরী) শিক্ষা দান ও হেদায়তের ধারা বাহ্যিক (জাহেরী) দৃষ্টিতে রুদ্ধ হয়ে গেল, তখন তিনি পার্থিবজগত পরিত্যাগ করে নির্জনতার বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ স্থানে উপনীত হয়ে গেলেন; এটা আউলিয়ায়ে কেরামদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য যে, যখন তাদের সম্পর্ক অবিনশ্বর জগতের (عالم عقبي) সাথে হয়ে যায় তখন তাদের মধ্যে কেউই প্রকাশ্যভাবে লক্ষ্যস্থলে পৌছানোর শিক্ষা ও নির্দেশনা দেন না।[১]

---

[১]. [এ উদ্ধৃতির ভাষ্য হল যে, তাদের জাহেরী বা প্রকাশ্য হেদায়ত ও নির্দেশনার ধারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় কিন্তু রূহানী বা আত্মিক শিক্ষা ও নির্দেশনা দানের ধারা অব্যাহত ও নিরবিচ্ছিন্ন থাকে। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামের অমিয় বাণীসমূহ অর্থাৎ হাদীস শরীফ মানবজাতিকে ঐভাবে নির্দেশনা প্রদান করে যাচ্ছে যেভাবে জীবদ্দশায় তাঁর আমল বা কর্ম পদ্ধতি ছিল। মহামহিম রবের বাণী–

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴿٢١﴾

–তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর জীবনে উত্তম আদর্শ রয়েছে। [আল আহযাব, ৩৩/২১]

হযরত সায়্যিদুনা গাউসে আযম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এ সূক্ষ্ম বিষয়াদি বর্ণনার পর বলেন।]

যদি তোমরা বুদ্ধিমান ও বিবেকবান হও তবে এসব কথা বুঝে নিবে, অন্যথায় কোন মাধ্যমে ইলমের নূর অর্জনের সাধনায় অবতীর্ণ হও, বুঝে আসবে। কারণ, প্রবৃত্তির তাড়নার উপর নূরানী সাধনা প্রভাবশালী হয়। যেটা দ্বারা বিবেক ও বোধশক্তি জ্যোতির্ময় হয়। অন্ধকার থেকে জ্যোতি লাভ করা যায় না। ঐ স্থানে যেটা নূর দ্বারা আলোকিত হবে তা প্রথম আরম্ভকারীর জন্য প্রতিফলিত হবে। আল্লাহর যে ওলী কায়িক জীবনের অধিকারী অর্থাৎ ওফাত লাভ করেনি সে ঐ নূরের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়। সে (মুরীদ) ঐ ওলীর পূর্ণ উত্তরাধিকার সূত্রে সম্বন্ধযুক্ত হয়। যেটা দু'ভাগে বিভক্ত। যথা–

১. تعليقية সম্বন্ধযুক্ত অর্থাৎ একটি বস্তুকে অন্য বস্তুর সাথে সম্বন্ধ স্থাপন করা।

২. تجريدية সম্বন্ধহীন অর্থাৎ কোন বস্তুকে অন্য বস্তু থেকে পৃথক করা।

কামিল পীর ও শায়খগণের এ উভয় বিষয়ে পরিপক্ক জ্ঞান থাকে এবং তিনি মুরীদকে ধীরে ধীরে আত্মশুদ্ধি ও বাতিনী পবিত্রতায় ভূষিত করেন। পরিশেষে ঐ ওলী কিংবা কামিল পীর স্বীয় অতীন্দ্রিয় শক্তি (كشف) এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার সাথে তার (মুরীদের) সম্বন্ধ ও বন্ধন সৃষ্টি করে দেন। যার ফলে সে দুনিয়া বিমুখ হয়ে যায়। অতঃপর তাকে ইহলৌকিক (জাহেরী) জীবনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে এরূপ বিলায়ত, কর্তৃত্ব ও প্রয়োগ শক্তি দান করা হয়। তার সম্বন্ধ বিশেষ নৈকট্যধন্য বান্দাদের সাথে হয়ে যায়। এরপর সেও বিভিন্ন বিষয়ে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে থাকে। অতঃপর ঐ গুণাবলীর কারণে সে আল্লাহর সৃষ্টিজগতের মধ্যে সূফী হিসেবে খ্যাতি লাভ করে। অধিকন্তু এরপরও একটি গভীর রহস্যের স্তর ও পদমর্যাদা রয়েছে। যেটা সম্পর্কে শুধুমাত্র মারিফাতপন্থীরাই অবগত। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِۦ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٨﴾

–আর মর্যাদা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনদের জন্য। কিন্তু মুনাফিকরা তা জানে না।[১]

[১]. আল কুরআন : সূরা মুনাফিকুন, ৬৩/৮

আর রূহসমূহের তারবীয়ত বা শিক্ষা দানের প্রসঙ্গটি হল যে, রূহে-জিসমানীর তারবীয়ত শরীরের মধ্যেই হয়ে থাকে। আর রূহে-রাওয়ানীর দীক্ষা জিহাদী আত্মা ও রূহে-সুলতানীর অন্তরের অন্তস্থলে ও রূহে কুদসীর তারবীয়ত লতীফায়ে সির'-এ হয়ে থাকে, যেটা বান্দা ও আল্লাহর মধ্যবর্তী বন্ধন ও সম্বন্ধের মাধ্যম এবং সৃষ্টির প্রতি আল্লাহর ভাষ্যকার। কারণ, তা আল্লাহর পরিচয় ও নিগূঢ় রহস্যাদির জ্ঞান লাভে ধন্য হয়। আর ঐসব স্বপ্ন, যা মন্দ প্রকৃতির সাথে সম্পৃক্ত তা নফসে আম্মারা, নফসে লাওয়ামা ও নফসে মুলহিমার গুণ বিশিষ্ট হয়। তাই যখন স্বপ্নে বিচরণশীল জন্তু অর্থাৎ বাঘ, সিংহ, কুকুর, শুকুর, চিতাবাঘ, খরগোশ, শৃগাল, বিড়াল, সাপ, কচ্ছপ ও বিচ্ছুসহ অন্যান্য ক্ষতিকর ও দংশনকারী প্রাণী পরিদৃষ্ট হবে তখন তা মানুষের কুস্বভাব ও অসৎগুণাবলী ব্যক্তকারী হবে। এরূপ মন্দ-স্বভাব ও কু-ধারণাসমূহ বর্জনের মাধ্যমেই আত্মিক (روحاني) উন্নতির পথ সুগম হতে পারে।

চিতা ঃ স্বপ্নে চিতা বাঘ দেখা ধোঁকা, আত্মদর্শন, আত্ম প্রদর্শনের এবং আল্লাহর প্রতি অহংকার ও ধোঁকার ইঙ্গিতবহ।

আল্লাহ তা'আলা বলন–

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا وَٱسْتَكْبَرُوا۟ عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَٰبُ ٱلسَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِى سَمِّ ٱلْخِيَاطِ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿٤٠﴾

–নিশ্চয় যারা আমার আয়াতসমূহ মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এবং অহংকার করেছে, তাদের জন্য আকাশের দ্বারসমূহ উন্মুক্ত করা হবে না। আর তারা জান্নাতেও প্রবেশ করতে পারবে না– যতক্ষণ না সূঁচের ছিদ্রপথে উষ্ট্র প্রবেশ করে। আর এভাবেই আমি অপরাধীদের প্রতিফল দিই।[১]

সিংহ ঃ সিংহ স্বপ্নে দেখা আত্ম গৌরব ও আল্লাহর সৃষ্টির উপর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার নিদর্শন।

[১]. আল কুরআন : সূরা আ'রাফ, ৭/৪০

ম্লীচ ঃ ম্লীচ দেখা আজ্ঞা পালনকারী ও অধীনস্থদের প্রতি ক্রোধ ও বড়ত্ব প্রকাশের নিদর্শন।

ভল্লুক ঃ স্বপ্নে ভল্লুক দেখার ব্যাখ্যা হল যে, স্বপ্নদ্রষ্টা অবৈধ ও সন্দেহযুক্ত বস্তু বিচার ও পার্থক্যহীনভাবে আহার করার নির্দেশক।

কুকুর ঃ স্বপ্নদ্রষ্টা দুনিয়ার প্রেমে আসক্ত হয়ে সর্বদা ক্রোধান্বিত থাকে।

শুকর ঃ শুকর স্বপ্নে দেখা হিংসা-বিদ্বেষ ও কু-বিপুর অভিলাষ ও চাহিদা নির্দেশক।

খরগোশ ঃ স্বপ্নদ্রষ্টা পার্থিব কাজে ছল-চাতুরীর আশ্রয় নেয়া।

শৃগাল ঃ স্বপ্নে শৃগাল দেখার ব্যাখ্যা ও খরগোশ দেখার ন্যায়। অবশ্যই খরগোশ ও শৃগাল দেখার মধ্যে অলসতার দোষই বেশী হয়ে থাকে।

বাঘ/কচ্ছপ ঃ দেখার ব্যাখ্যা হল যে, স্বপ্নদ্রষ্টার মাঝে মূর্খতার কারণে পার্থিব আসক্তি, নেতৃত্বের অভিলাষ, বিজয় ও প্রতিপত্তি নির্দেশক।

সাপ ঃ দ্রষ্টা লোকদেরকে রসনার মাধ্যমে কষ্টদানে নিয়োজিত রয়েছে। যেমন- গালি-গালাজ, মিথ্যা অভিযোগ করা, পরনিন্দা, মিথ্যা বলা, ভুল সাক্ষ্য দেয়া ইত্যাদি।

এরূপ অনিষ্টকারী বিচরণশীল প্রাণী ও হিংস্র জন্তুসমূহ স্বপ্নে দেখার সঠিক ব্যাখ্যা অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লোকেরাই অবগত।

বিচ্ছু ঃ দ্রষ্টার স্বভাব হল গোপনে বিভিন্নভাবে লোকদেরকে কষ্ট দেয়া। যেমন- গোপন বিষয় প্রকাশ করে দেয়া, অপবাদ দেয়া, অন্যের ছিদ্রান্বেষণ করা ও চোগলখোরীর স্বভাব।

বোলতা ঃ স্বপ্ন দেখা, জনসাধারণকে কথার মাধ্যমে কষ্ট দেয়া ও মানুষের সাথে বিনা কারণে শত্রুতা পোষণের ইঙ্গিতবহ। যেভাবে সাপ দেখার ব্যাখ্যায় বিদ্যমান।

যখন তরীকতপন্থী ব্যক্তি এসব অনিষ্ট সাধনকারী প্রাণীর সাথে সংগ্রামে লিপ্ত দেখে এবং অনুধাবন করে যে, আমি ঐগুলোর উপর বিজয় লাভ করতে পারব না, তখন তার জন্য উচিত হল- ইবাদত, সাধনা ও যিক্‌র-আযকারে ব্যাপৃত থাকা। ততক্ষণ পর্যন্ত কৃচ্ছ সাধনা ও যিক্‌রে তন্ময় থাকা যতক্ষণ না সে ঐসব জন্তুসমূহের উপর বিজয় লাভ করে, বিজয়ীবেশে সেগুলোকে পরাজিত ও ধ্বংস না করে কিংবা এরপর তাদের মধ্যে হিংস্র স্বভাবের যেসব গুণাবলী পাওয়া যায়

সেগুলো পরিবর্তন করে মানবীয় স্বভাবে পরিণত না করে। কারণ, তাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করা ও তাদেরকে নস্যাৎ করে দেয়াই হল কুরিপু ও যাবতীয় অনিষ্টতার পরিপূর্ণ অবসান ও কবর রচনা করে দেয়া।

আল্লাহ তা'আলার বাণী–

كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّـَٔاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ۝٢

–আল্লাহ তাদের পাপরাশি মিটিয়ে দিয়েছেন এবং তাদের (প্রকাশ্য ও অভ্যন্তরীণ অবস্থা) সংশোধন করে দিয়েছেন।[১]

যদি স্বপ্নে হিংস্র জন্তুকে মানবাকৃতিতে দেখে তবে এর ব্যাখ্যা হবে যে, তার পাপ সমূহ পুণ্যে পরিবর্তন করে দেয়া হয়েছে।

যেমন, তাওবাকারীদের ব্যাপারে এরশাদ হয়েছে–

إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَـٰلِحًا فَأُوْلَـٰٓئِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّـَٔاتِهِمْ حَسَنَـٰتٍ ۝٧٠

–যে তাওবা করেছে, ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, আল্লাহ তা'আলা তার পাপরাশি পুণ্যে পরিবর্তন করে দেবেন।[২]

অতএব, এর তা'বীর হবে যে, সে তার অনিষ্টকারী শত্রুদের থেকে পরিত্রাণ লাভ করেছে। অধিকিন্তু এরপরও মানুষের জন্য অত্যাবশ্যক হল, ঐসব শত্রুদের বিপর্যয় থেকে নির্ভয় না থাকা। কারণ, কু-স্বভাবসমূহ নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার পরও নফসের মধ্যে পাপ প্রবণতার এমন একটি চরিত্র থেকে যায় যেটা কোন এক সময় নফসে-মুতমায়িন্নার উপর প্রভাব বিস্তার করে বিজয়ের সম্ভাবনা রাখে। অতএব বান্দার জন্য উচিত হল, সর্বদা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশানুযায়ী সকল প্রকার বিপদ ও কু-স্বভাব থেকে বেচে থাকার প্রচেষ্টায় থাকা। কখনো নফসে-আম্মারা কাফের ও মুশরিকের আকৃতিতে, নফসে-লাওয়ামা ইয়াহুদী ও নফসে-মুলহিম খ্রীষ্টানদের আকৃতিতে বরং এতদভিন্ন অসংখ্য বিরল ও দুর্লভ আকৃতিতে দেখা যেতে পারে। (যেমন ভ্রান্ত বিশ্বাসী ও গোস্তাখদের আকৃতিতে, আল্লাহ তা'আলাই সর্বজ্ঞ।)

[১]. আল কুরআন : সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭/২
[২]. আল কুরআন : সূরা ফুরকান, ২৫/৭০

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

তাসাউফ ও সূফী সম্প্রদায়

সূফী সম্প্রদায় বার দলে বিভক্ত। যথাক্রমে–

১. আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত ঃ প্রথম প্রকার হল ঐসব লোক যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের অনুসারী। তাদের যাবতীয় বক্তব্য ও কাজ শরীয়ত ও তরীকতের নীতিমালা অনুযায়ী হয়ে থাকে। এরাই হল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত। তাদের মধ্যে অনেক সৌভাগ্যবান বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। কারো কারো নামসর্বস্ব হিসাব হবে। অতঃপর কোনরূপ শাস্তি ও লাঞ্ছনা ব্যতীত জান্নাতে প্রবিষ্ট হবে। আর কারো প্রথাগত লঘু শাস্তি হবে। অতঃপর তাদেরকেও জান্নাতে প্রবেশের সুসংবাদ দেয়া হবে। কাফির, মুশরিক, বিদআতী প্রমুখ সকলেই জাহান্নামের চিরস্থায়ী অধিবাসী হবে। স্মর্তব্য যে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত ব্যতীত অন্যসব দল বিদআতী। নামসর্বস্ব পীর ও সূফী সম্প্রদায়গুলো হল খালুলিয়া, হালিয়া, আউলিয়ায়িয়া, শিমরানীয়া, হাব্বিয়া, হুরিয়া, আবাহিয়্যা, মুতাকাসিলা, মুতাজাবিলা ওয়াকিফিয়া ও ইলহামিয়া। নিম্নে তাদের আকীদা ও মতবাদ বিশ্লেষিত হল-

২. মাযহাবে খালুলিয়া (مذهب خلولية) ঃ এ সম্প্রদায়ের আকীদা হল যে, রূপসী ও সুশ্রী নারী ও শ্মশ্রুহীন বালকদের প্রতি অপলক নয়নে দৃষ্টিপাত করা বৈধ এবং তাদের সাথে রঙ্গনাচ ও মদ্য পানের আসর জমানো, চুম্বন ও সংশ্রব অনুমোদিত (مباح)। অথচ এসব শরয়ী দৃষ্টিতে প্রকাশ্য কুফরীর পর্যায়ভুক্ত।

৩. মাযহাবে হালীয়া (مذهب حالية) ঃ এ ফির্কার আকীদা হল যে, রঙ্গনাচ করা ও হাততালি বাজানো বৈধ। তাদের বক্তব্য হল যে, এটা তো শায়খের একটি অবস্থা কিংবা পজিসনের নাম। শরীয়ত তাতে কোন বিধান আরোপ করে না। এরূপ মতবাদ ও বিশ্বাস সম্পূর্ণ নবোদ্ভাবিত (بدعة) ও সুন্নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরিপন্থী।

৪. মাযহাবে আউলিয়ায়িয়া (مذهب اوليائية) ঃ এ সম্প্রদায়ের আকীদা হল যে, মানুষ যখন বিলায়তের পদমর্যদায় অভিষিক্ত হয় তখন তার উপর শরীয়তের

নির্দেশ ও অনুশাসন প্রয়োগের বিধান নিঃশেষ হয়ে যায়। তাদের আরো বক্তব্য হল যে, ওলী পদমর্যাদায় নবীর চেয়েও উৎকৃষ্ট। কারণ, নবীর জ্ঞান ওহীর মধ্যস্থতায় হয়ে থাকে। কিন্তু ওলীর জ্ঞান কোনরূপ প্রত্যাদেশ (وحي) ছাড়াই অর্জিত হয়। বস্তুত এরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তারা চরম ভ্রান্তির শিকার হয়েছে। ঐ ভ্রান্ত বিশ্বাসের কারণে তারা ধ্বংসের আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। এরূপ আকীদা পোষণ করা সম্পূর্ণ কুফরী।

৫. মাযহাবে শিমরানিয়া (مذهب شمرانية) ঃ এ দলের আকীদা হচ্ছে, সান্নিধ্য হল কদীমী। এটার কারণে আদেশ ও নিষেধের বিধান রহিত হয়ে যায়। তারা সেতারা, সারেঙ্গী ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র বাজানোর মাধ্যমে আমোদ-প্রমোদ ও বিনোদনকে বৈধ (حلال) মনে করে, কিন্তু নারীদের সাথে কোনরূপ সম্বন্ধ ও সংশ্রবকে তারা বৈধ ও হালাল মনে করে না। এরাও কাফির, এদরেকে হত্যা করা বৈধ।[১]

৬. মাযহাবে হাব্বিয়া (مذهب حبية) ঃ এ সম্প্রদায়ের বিশ্বাস হল যে, মানুষ যখন প্রেমের স্তরে (مقام محبت) উপনীত হয় তখন সে শরীয়তের বিধান অনুবর্তী ব্যক্তি (مكلف) থাকে না। এ জন্য তারা আপন লজ্জাস্থানকেও আবৃত রাখে না।

৭. মাযহাবে হুরীয়্যা (مذهب حورية) ঃ এ ফির্কার আকীদাও হালীয়া সম্প্রদায়ের ন্যায় কিন্তু তারা এটাও দাবী করে যে, রঙ্গনাচ ও ওয়াজদ (অচৈতন্য) অবস্থায় তারা বেহেশতের হুরদের সাথে সহবাস করে। এজন্য যখন তারা হুশ ও সজাগ হয় তখন গোসল করে। তাদের এ বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও ধ্বংসাত্মক।

৮. মাযহাবে বাহীয়্যা (مذهب باحية) ঃ এ সম্প্রদায় সৎকর্মের নির্দেশ ও অসৎকর্মে নিষেধাজ্ঞার বিধানকে অস্বীকার করে। অবৈধকে বৈধ মনে করে, অন্যের স্ত্রীর সাথে বিশেষ সম্পর্ক গড়াকে অনুমোদিত (مباح) বলে বিশ্বাস করে।

৯. মাযহাবে মুতাকাসিলা (مذهب متكاسلة) ঃ তাদের আকীদা হল কাজকর্ম থেকে বিমুখ হয়ে উদভ্রান্তভাবে অন্যের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ানো। তারা

[১]. ইসলামী বা মুসলিম সরকার আদালতের রায়ের ভিত্তিতে হত্যার বিধান কার্যকর করবে।

বাহ্যিকভাবে দুনিয়া ত্যাগের দাবীদার কিন্তু তারা সজোরে আর্তনাদ করে করে তাদের কষ্ট ও দুর্দশার কথা প্রকাশ করে। এরাও এ ভ্রান্ত বিশ্বাসের কারণে ধ্বংসের অতল গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হয়েছে।

১০. মাযহাবে মুতাজাবিলা (مذهب متجابلة)

১১. মাযহাবে ওয়াকিফিয়া (مذهب واقفية) ঃ এসব লোকের মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গি হল কেউ আল্লাহর পরিচয় লাভ করতে পারে না। এজন্য তারা ক্ষমা ও মার্জনা প্রার্থনা করা ছেড়ে দিয়েছে। এরাও এ অজ্ঞতাপূর্ণ বিশ্বাসের কারণে বিপর্যস্ত হয়েছে।

১২. মাযহাবে ইলহামিয়া (مذهب الهامية) ঃ এদের আকীদা হল দ্বীনের জ্ঞান (علم دين) অন্বেষণ বর্জন করা। আর পাঠদানের ধারাও প্রতিষ্ঠা না বরং বিজ্ঞদের (حكماء) অনুসরণ করা। অর্থাৎ যুক্তিবিদ ও দার্শনিকদের কথার উপর আমল করা। তাদের মতে কুরআন করীম একটি পর্দা মাত্র। তারা কবিতাকে তরীকতের কুরআন মনে করে। এ জন্য তারা কুরআন করীম ও ওযীফা পাঠ বর্জন করেছে। তারা শুধুমাত্র কবিতা চর্চা করে। তাদের সন্তানদেরকেও গোমরাহীর আস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করেছে। ইলমে ফিকহের ব্যাপারে তাদের বক্তব্য হল যে, এটা অপ্রকাশ্য (باطني) জ্ঞানের অধিভুক্ত।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বক্তব্য হল যে, সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংশ্রবের কারণে আবেগময়ী ছিলেন। অতঃপর যখন ঐ অনুরাগ রূহানী আকর্ষণের মাধ্যমে ফয়েজ প্রাপ্ত হয়ে তরীকতের মাশায়েখদের নিকট পৌঁছেছে তখন তা অসংখ্য সিলসিলা ও পরম্পরায় বিভক্ত হয়ে গেছে। যার ফলে তাদের মধ্যে ক্রমান্বয়ে দুর্বলতার আবির্ভাব হয়েছে। ফলশ্রুতিতে তাদের প্রভাব বিনষ্ট হয়ে গেছে, এমনকি কতিপয় রূহানী সিলসিলার নামও অবশিষ্ট থাকল না। হ্যাঁ! অবশ্যই ফয়েজ, প্রভাব ও অর্থহীন প্রথাগত মাশায়েখে কেরামের কাঠামো অবশিষ্ট থাকল। এরপর ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে বিদআতী বাদক দল সৃষ্টি হয়ে গেল। কেউ কেউ নিজদেরকে কলন্দর (ভবঘুরে ফকীর) বানিয়ে বসল। কেউ সিলসিলায়ে হায়দারীয়া, কেউ আদহামীয়া এবং কেউ কেউ অন্যান্য সিলসিলাসমূহের সাথে নিজদের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করল। যেটার ব্যাখ্যা ও বিবরণ

অত্যন্ত দীর্ঘ। তরীকত ও মারিফাতপন্থী এবং দিশাদানকারী লোকের সংখ্যা এ যুগে অতি স্বল্প।

পর্যবেক্ষণকারীরা অর্থাৎ ফকীহগণ বাহ্যিক (ظاهري) আমল দেখে সত্য দল মনে করে বসে। কিন্তু অর্ন্তদৃষ্টিসম্পন্নরা নিজেদের বাতিনী স্বচ্ছতা ও নির্মলতার কারণে এসব লোকদের আসল পরিচয় অবগত। ফকীহগণ শরয়ী বিধানের সমর্থনে আদেশ ও নিষেধ বাস্তবায়নে সর্বদা প্রস্তুত ও তৎপর থাকেন। একথা কারো নিকট গোপন নয়।

সাহিবে বাতেন ঃ সাহিবে বাতেন হল, এমন ব্যক্তি যে তরীকতের পথকে অন্ত দৃষ্টি দ্বারা এভাবে অবলোকন ও পর্যবেক্ষণ করেছে যে, তাতে তার পথ প্রদর্শক (مقتداء) অর্থাৎ হুযুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাহ্যমাত্রিক বৈশিষ্ট্যময় সত্তাকেও অন্তরচক্ষু দ্বারা দর্শন করে। এমন ব্যক্তির পথচলা আল্লাহ তা'আলার কৃপা ও তাঁর হাবীব রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামের রূহানী শক্তি দ্বারা কায়া ও আত্মার পারস্পরিক সমন্বয়ের মাধ্যমে সু-উচ্চ পদমর্যাদা লাভের মাধ্যম হবে। কারণ শয়তানের পক্ষে তো হুযুরপুর নূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের আকৃতি ধারণ করা সম্ভব নয়। হাদীস শরীফে এরূপ ইচ্ছুক তরীকতপন্থীদের (سالكين) জন্য একটি ইঙ্গিত রয়েছে যে, যেন তারা তরীকতের পথে বিচরণ করে অন্ধকার থেকে নিরাপদ হয়ে যায়। এ ছাড়া সত্য-অসত্যের মধ্যে পার্থক্য করার জন্য হাদীস শরীফে এমন সব বাণী রয়েছে যেগুলো যোগ্য ব্যক্তি ব্যতীত অন্যদের বুঝে আসতে পারে না।

চতুর্বিংশ অধ্যায়

পরিশিষ্ট

তরীকতপন্থীর (سالك) জন্য উচিত, সে যেন সে বুদ্ধিমান, চতুর ও চাক্ষুস্মান হয়। যেমন কোন কবি বলেছেন–

اِنَّ لله عَبْادًا فَطِنًا

طَلَّقُوْ الدُّنْيَا وَخَافُوْا الِمحْنَا

جَعَلُوْهَا لجةً فَا تَخِذُوْا

صَالِحَ الْاَعْمَالِ فِيْهَا سُفَنًا

নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলার এমন অনেক বিবেকবান ও বুদ্ধিমান বান্দা রয়েছে যারা পার্থিব জগতকে তালাক দিয়ে রেখেছে এবং দুনিয়ার বিপর্যয় ও ধোঁকার ব্যাপারে সন্ত্রস্ত রয়েছে। আর তারা এর বিবর্তন ও ঘূর্ণিপাকের উত্তাল তরঙ্গ থেকে উপকূলে পৌছার জন্য পুণ্য কর্মের তরীকে মাধ্যম বানিয়ে রেখেছে।'

সালেকের জন্য এটাও জরুরী যে, পার্থিব সকল কর্মকাণ্ডকে সম্মুখে রেখে এগুলোর পরিসমাপ্তির (خاتمة) প্রতি গভীর চিন্তা করা। দুনিয়ার বাহ্যিক আকর্ষণ ও চাকচিক্য দেখে ধোঁকায় পতিত হবে না। জনৈক সূফীর বাণী– "হালসমূহের পথ তাদের অবস্থার বিবর্তন ও পরিবর্তন থেকে বানানো হয়।"

যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী–

فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿٩٩﴾

–বস্তুত ক্ষতিগ্রস্থ সম্প্রদায় ব্যতীত কেউ আল্লাহর কৌশল হতে নিরাপদ মনে করে না।[১]

অর্থাৎ মুখলিস ব্যক্তি তো সর্বদা আল্লাহর পাকড়াওয়ের ব্যাপারে সন্ত্রস্ত থাকে।

হাদীসে কুদসীতে রয়েছে–

يَامُحَمَّدُ بَشِّرِ الْمُذْنِبِيْنَ بَاَنِّيْ غَفُوْرٌ وَّاَنْذِرِ الصَّدِيْقِيْنَ بَاَنِّيْ غَيُوْرٌ ،

[১]. আল কুরআন : সূরা আ'রাফ, ৭/৯৯

–হে প্রিয় হাবীব! পাপীদেরকে সুসংবাদ শুনিয়ে দিন যে, আমি মার্জনাকারী আর সিদ্দীকীনদেরকে ভীতি প্রদর্শন করুন যে, আমি পাকড়াওকারী।

নিশ্চয় ওলীগণের কারামত সত্য। তাঁদের অবস্থাদিও সত্য। কিন্তু তা ধোঁকা থেকে নিরাপদ নয়। অধিকন্তু সম্মানিত নবী ও রাসূলগণ এমন সব কথা থেকে স্থায়ীভাবে নিরাপদ ও মুক্ত। বলা হয়েছে, এটাও হতে পারে যে, ওলী কিংবা তাঁর অনুসারী কারামত প্রদর্শনের কল্পনা করবে আর তা ইস্তিদরাজ হবে, যার কারণে তার শুভ সমাপ্তি (خاتمة بالخير) হবে না। কারণ, কর্মের অনিষ্টতা ও বিপর্যয়ের ভয়ই শুভ সমাপ্তির কারণ ও মুক্তির মাধ্যম হয়। হযরত খাজা হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন– "সম্মানিত ওলীগণ খোদাভীতির কারণে আ'লা ইল্লীয়ীনে সমাসীন হতে পারে। ভয়ের উপর আশা প্রবল হওয়া উত্তম। যেন এটি না হয় যে, সে মানবীয় দুর্বলতার কারণে পদচ্যুত হবে এবং এমন কর্মে অভিযুক্ত হয়ে যাবে যেটা তার নিকট অনভূত হবে না।"

যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ সুস্থ ও সবল থাকবে ভয়কে আশার উপর প্রাধান্য দিবে। আর যখন পীড়িত ও ব্যধিগ্রস্থ হয়ে যাবে তখন আশাকে ভয়ের উপর প্রাধান্য দিবে। অবশ্যই মৃত্যুর প্রাক্কালে আল্লাহ তা'আলার কৃপা ও অনুগ্রহের ব্যাপারে আশাকে ভয়ের অগ্রে রাখবে। যেমন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন–

لَايَمُوْتَنَّ اَحَدُكُمْ اِلاَّ وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللهِ تَعَالِيْ ،

–তোমাদের কেউই যেন আল্লাহর প্রতি উত্তম ধারণা পোষণ করা ব্যতীত মৃত্যুবরণ না করে।

আর তাঁর দয়া ও অনুগ্রহের নিদর্শনাদির প্রতি চিন্তা করবে।

যেমন আল্লাহর বাণী–

وَرَحْمَتِى وَسِعَتْ كُلَّ شَىْءٍ ۚ ﴿١٥٦﴾

–আমার অনুগ্রহ প্রত্যেক বস্তুকে বেষ্টন করে রেখেছে।[১]

[১]. আল কুরআন : সূরা আ'রাফ, ৭/১৫৬

আরো বলেছেন—

رَحْمَتِيْ سَبَقَتْ غَضَبِيْ فَاَنَا اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ ،

—আমার অনুকম্পা ও অনুগ্রহ আমার ক্রোধের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে। নিশ্চয় আমি অত্যাধিক করুণাময়, দয়ালু।[১]

সালেকের জন্য এটাও অত্যাবশ্যক যে, আল্লাহ তা'আলার ক্রোধ ও রোষের পরিবর্তে তার দয়া ও অনুকম্পা লাভে অগ্রসর হওয়া। আর তা এভাবে যে, সে নিজকে তাঁর দরবারে অত্যন্ত শিষ্ট ও বিনম্রচিত্তে সমর্পণ করবে, অত্যন্ত বিনয়ের সাথে উত্তমপন্থায় আবেদন পেশ করবে, পাপের মার্জনা প্রার্থনা করবে, তাঁর রহমতপূর্ণ ভাণ্ডারসমূহ থেকে দয়া ও দান প্রাপ্তির আশা রাখবে। কারণ, তিনি অধিক দানশীল (جوّد)। তিনিই আদি ও প্রকৃত সম্রাট।

وَصَلَّي اللهُ تَعَالِي عَلي سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدٍ وَعَلي اَلِه وَصَحْبِه وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا اِلِي يَوْمِ الدِّيْنِ ، سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّتِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلاَمٌ عَلي الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ،

[১]. বোখারী : আস্ সহীহ, ২২/৪৩২; আহমদ : মসনদ, ১২/২২৮